সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

সপ্তম ও অষ্টম সংস্করণ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২১ ■ ৪৯তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

বি জি প্রেস তুলে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

বি জি প্রেস শুধুমাত্র একটি সরকারী প্রিন্টিং প্রেস নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী গর্ব করার মতো একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলার গর্ব করার মতো, অহঙ্কার করার মতো প্রতিষ্ঠান। ১৯০৫ সালে এখানকার শ্রমিক কর্মচারীরা দাবি আদায়ে মাসাধিককাল লাগাতার ধর্মঘট করে শ্রমিকদের দাবি মানতে বাধ্য করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের তৎকালীন সর্বোচ্চ নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রমিকদের নিয়ে রাজপথে মিটিং, মিছিল করেছেন। এটাই ছিল ভারতবর্ষের প্রথম সরকারী কর্মীদের ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়েই জন্ম হয়েছিল ভারতের প্রথম সরকারী কর্মীদের সংগঠন পুনরায় 'বেঙ্গল প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'-এর। ১৯৩০ সালে এখানে লাগাতার ধর্মঘট হয়।

১৯৩৬ সালে অবিভক্ত বাংলার গভর্নর এ্যান্ডারসন বি জি প্রেস পরিদর্শনে আসেন। সেই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—"A Peep into the Bengal Government Press-1936"। ১৯১৮ সালে বর্তমান ঠিকানায় (গোপালনগর, আলিপুর) প্রেস চালু হওয়ার পর ১৯৩৬ সালে নতুন করে আধুনিকীকরণ শেষ হয়। তখনকার স্টেট অব দি আর্ট সাইজের একটা বই (রামায়ণ, মহাভারত সাইজের) একদিনে কম্পোজ, প্রিন্টিং, বাইন্ডিং করে ডেলিভারী করার ক্ষমতা অর্জন করে বি জি প্রেস। এই ধরনের ক্ষমতা তখন বিশ্বের মাত্র ৩/৪টি প্রেসেরই ছিল।

'উত্তাল চল্লিশ'-এর দশকে, ১৯৪৬ সালে পুনরায় এই প্রেসের শ্রমিকরা ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে দাবি আদায় করে। একসময় শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ এখানে চাকরি করতেন। ভারতের মুদ্রণ জগতে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে এই প্রেস। একসময় এটা এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসের মর্যাদায় ভূষিত হতো। বামফ্রন্ট সরকার এই প্রেসকে 'হেরিটেজ' মর্যাদায় ভূষিত করে আধুনিকীকরণ শুরু করেছিল। কয়েক বছর পূর্বেও বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনের ৬/৭ কোটি ব্যালট পেপার এখানে একসঙ্গে ছাপা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য বাজেটের সাড়ে সাত হাজার পাতা ছাপার ক্ষমতা এই প্রেসের আছে। তাহলে কেন এমন ঐতিহ্যবাহী প্রেস বন্ধ করার তুঘলকী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং রাজ্য মিশনারিজ-এর সাহায্যে বি জি প্রেস বিপুল পরিকাঠামো নিয়ে সেজে ওঠে। ৪৫০ পাতার রয়াল অক্টাভো

প্রমোটার চক্রের কুনজরে শতাব্দী প্রাচীন বি জি প্রেস

বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখছেন বিজয় শঙ্কর সিংহ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

মহার্ঘভাতার ফারাক বেড়েই চলেছে
বঞ্চিত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা

বছরে একবারই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্তির তালিকায় ছিল মহার্ঘভাতা। কিন্তু ২০২০ সালের পর ২০২১ কেটে গিয়ে ফের ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস পড়লেও সেই একবারের প্রাপ্য অধরাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বর্তমানে প্রাপ্ত মহার্ঘভাতা ৩১ শতাংশ। সেখানে এরাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের ডিএ প্রাপ্তি মাত্র ৩ শতাংশ। ২৮ শতাংশ পিছনে পড়ে আছে এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা। দেশের ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মাঝারি আয়ের রাজ্যের সংখ্যা ১৬টি। পশ্চিমবঙ্গ সেই মাঝারি আয়ের রাজ্যের মধ্যেই পড়ে। মাঝারি আয়ের রাজ্যগুলির সরকারী কর্মচারীরা বর্তমানে ২৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। গোটা দেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিরিখে বেতন বঞ্চনার শীর্ষে এ রাজ্যই।

সেই সময়ে প্রাপ্য ১৬ শতাংশ

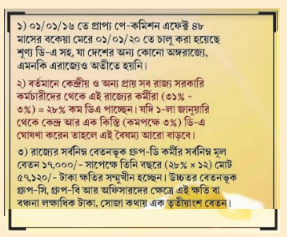

মহার্ঘভাতাকে যুক্ত করেই, পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশক্রমে সংশোধিত বেতন ও ভাতা চালু হয়েছিল। এখন ঠিক তার উলটো। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রোপা বিধিতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া ছিল, যেমন যেমন কর্মীদের ডিএ পাওনা হবে, তেমনভাবেই মূল বেতনের সঙ্গে যুক্ত হবে মহার্ঘভাতা। এখন মহার্ঘভাতা কথাটিকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের আমলে ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ সহ রোপা বিধিতে।

এক শতাংশ ডিএ দিতে আগে রাজ্য সরকারের খরচ পড়ত ২৫ কোটি টাকা। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে এ রাজ্যে কর্মীদের মাত্র ২.৫ শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে এখন ১ কিস্তি ডিএ-তে সরকারের খরচ হবে ৬৪ কোটি টাকা। প্রাপ্য ২৮ শতাংশ ডিএ-তে সরকারের মাসে খরচ ১৭৯২ কোটি টাকা। ছয় বছরে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা কর্মীদের থেকে সরিয়ে নিয়ে কার্যত আর্থিক লুট চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। গড়ে প্রতি বছর সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার ওপর কর্মীদের বঞ্চনা করে সরিয়ে নিয়েছে রাজ্য। আর এই সময়ই রাজ্যের আই এ এস আধিকারিকদের বিপুল পরিমাণ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

তিন দফা দাবিতে

পাহাড় থেকে সাগর
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিক্ষোভ

৩ ফেব্রুয়ারি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে জনবিরোধী কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে, ২৮ শতাংশ

বীরভূম

বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদানের দাবিতে এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসরকালীন

উত্তর ২৪ পরগনা

পেনশন বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্তের তীব্র বিরোধিতা করে সারা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ দেখালেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বে

কোচবিহার

নির্ধারিত ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণের জন্য এই দিনেই রাজ্য সরকারের কাছে নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সংগঠন। কিন্তু কিছু

মহাকরণ

অনিবার্য কারণে ধর্মঘট পিছিয়ে যাওয়ায়, নোটিশ প্রদানের সিদ্ধান্ত মুলতুবী রেখে, উল্লিখিত তিনটি দাবি নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচীতে রাজ্য কর্মচারীদের

বাঁকুড়া

অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। সংগঠনের

নদীয়া

এই ডাকে সাড়া দিয়ে দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্যের প্রতিটি জেলার সদরে দুপুরে

আলিপুরদুয়ার

টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভাগুলিতে হাজির হন কয়েক হাজার কর্মচারী। শুধু জেলা

পূর্ব মেদিনীপুর

সদরেই নয়, বেশ কিছু জেলার মহকুমা ও ব্লকেও তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা।

দার্জিলিং জেলার খরিবারি,

পশ্চিম মেদিনীপুর

নকশালবারি, ফাঁসিদেওয়া ব্লকে, নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ, দুই মাইল, সুভাষ পল্লী, শক্তিগড় ও কাছারি রোড সেকটরের বিক্ষোভ কর্মসূচীতে শতাধিক কর্মচারী অংশ

নব মহাকরণ অঞ্চল

নেন। এছাড়াও কোচবিহারের মাথাভাঙা ও দিনহাটার মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচী হয়। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, আলিপুরদুয়ার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, পশ্চিম

পূর্বাঞ্চল

মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি জেলার সদরে এবং বাঁকুড়া জেলার খাতড়া ও বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনেও বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা।

মুর্শিদাবাদ

কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবনের সামনে একইভাবে বিক্ষোভ দেখান কর্মচারীরা। জেশপ বিল্ডিং, নবমহাকরণ, খাদ্যভবন, বাণিজ্যকর ভবন, বি জি প্রেস,

ঝাড়গ্রাম

বিকাশ ভবনের কর্মসূচীতে করোনা বিধির কারণে বিভিন্ন দপ্তরে রোস্টার ডিউটি সত্ত্বেও

বর্ধমান

কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সভাগুলিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয়

পুরুলিয়া

নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। জেশপ বিল্ডিং-এর সভায় বক্তব্য রাখেন

মধ্যাঞ্চল

সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। □

সম্পাদকীয়

ধর্মঘট ছাড়া কোনো পথ নেই

দেশব্যাপী দু'দিনের সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ ও ২৯ মার্চ। যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলি যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই ধর্মঘটের সমর্থনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে একক বা যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। স্বাভাবিকভাবেই অতিমারির কারণে বহু সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারীকে সমবেত করে, বৃহৎ আকারের সভা-সমাবেশ বা মিছিল না করে, জোর দেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট বৈঠকী সভা, গেট সভা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ইত্যাদির ওপর। অর্থাৎ ধর্মঘট ডাকতে একরকম বাধ্য হলেও, যথেষ্টরকম দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে কোভিড সুরক্ষা বিধিকে মান্যতা দিয়েই ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ নিয়োগকর্তার কাছে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদানও করবে।

এখন পর্যন্ত স্বঘোষিত 'নিরপেক্ষ' সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমগুলি, ধর্মঘটের কথা জানলেও, প্রায় নীরবই রয়েছে। ভাবখানা এমন যেন, ওটা কোনো ব্যাপারই হবে না। মশা তাড়ানোর ভঙ্গীতে রাষ্ট্র / সরকার এটাকে 'ম্যানেজ' করে নেবে। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, ধর্মঘটের দিন যতই এগিয়ে আসবে, মিডিয়াকুলের নীরবতা ভাঙবে। এবং কোমর বেঁধে ধর্মঘট হলে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষের কতরকম অসুবিধা হতে পারে তার ফিরিস্তি পেশ করা শুরু হবে। বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির 'পোস্ট এডিটোরিয়াল' কলামে কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি 'কেন ধর্মঘট দেশ ও জাতির পক্ষে হানিকারক'—বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তি সাজিয়ে তা পাঠকদের বোঝানোর দায়িত্ব নেবেন। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের 'প্রাইম টাইম'-এ 'ঘণ্টাখানেক' উচ্চগ্রামে কান ঝালাপালা করে দেওয়া বাক্-বিতণ্ডা চলবে। এই 'লাইভ' তরজায় যদিওবা কেউ ধর্মঘটের পক্ষে বলার চেষ্টা করেন (অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেইভাবেই ঘুঁটি সাজিয়ে) বাকিরা সমস্বরে তাঁকে জনস্বার্থ বিরোধী বলে দেগে দিয়ে কোণঠাসা করবেন। ভীষ্মলোচন শর্মাকেও লজ্জায় ফেলে দিতে পারে এমন গলার জোর যাঁদের, তাঁদের তারস্বরে চিৎকার থেকে মাঝে-মাঝেই ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন সরে গিয়ে, স্টুডিয়োয় উপস্থিত নেই এমন কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করা হবে। তিনি মুচকি হেঁসে, হিমশীতল কণ্ঠে একদিনের ধর্মঘটে কত কর্মদিবস নষ্ট হয়, মোট জাতীয় উৎপাদনের কত অংশ ক্ষয় হয়—স্ট্যাটিস্টিকস্ দিয়ে শ্রোতাদের বোঝাবেন।

এর বাইরেও রয়েছে, অনেকটাই খোলামেলা 'সোশ্যাল মিডিয়া' প্ল্যাটফর্ম। যেখানে ধর্মঘটের পক্ষে-বিপক্ষে উভয়মুখী প্রচারের ঝড় উঠবে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে (সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম) ধর্মঘট কেন্দ্রিক প্রচারে (বা অপপ্রচারে) দুটি বিষয়কে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হবে—(১) ধর্মঘটটির চরিত্র এবং (২) ধর্মঘটের দাবিসমূহ।

ধর্মঘটের চরিত্রকে এড়িয়ে যাওয়া বা আড়াল করার জন্য এ রাজ্যে একে শুরু থেকেই বলা হবে 'বাংলা বন্ধ'। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি দেশজুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দিলেও, একে বলা হবে 'বামেদের' ডাকা বাংলা বন্ধ। আবার বামেদের মধ্যেও বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলকে নিশানা করা হবে। সর্বোপরি বিধানসভায় বামেদের শূন্য আসন প্রাপ্তির প্রসঙ্গকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে টেনে এনে, ধর্মঘটের গায়ে অনৈতিকতার লেবেল সেঁটে দেওয়া হবে। ধর্মঘটের গুরুত্বকে ঘেঁটে দেওয়ার এই উদ্যোগের সম্ভাব্য ক্যাচ লাইন হবে 'বঙ্গীয় রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক বামেদের আবারও একটি কর্মনাশা বন্ধ'।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলি ধর্মঘটের ১২ দফা দাবিকে একত্রিত করে একটি বাক্যবন্ধনী রচনা করেছে। তা হল, 'দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচানোর ধর্মঘট'। এই বন্ধনীটি যে আক্ষরিক অর্থেই যথার্থ, তা দাবিগুলির দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। করোনা অতিমারিপর্ব শুরু হওয়ার আগে থেকেই দেশের অর্থনীতির বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। দারিদ্র ও অসাম্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল সেই সময় থেকেই। বেকারির হার শিখর ছুঁয়েছিল। এর কোনোটির জন্যই প্যানডেমিক দায়ি ছিল না। কারণ কোভিড-১৯ তখনও এদেশের বুকে থাবা বসায়নি। সেই সময়কার উল্লিখিত সঙ্কটগুলির জন্য দায়ি ছিল, স্পষ্টতই কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং গৃহীত পদক্ষেপ। শুরু থেকেই মোদি সরকারের কাছে 'পাখির চোখ' ছিল দেশি-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির সেবা। এর আগে যারা সরকার চালিয়েছে, তারা যে ধোয়া তুলসীপাতা ছিল, তা নয়। কম-বেশি একই রোগ তাদেরও ছিল। কিন্তু একাজে মোদি সরকারের 'ডিটারমিনেশন' অতীতের সমস্ত সরকারকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বেমক্কা 'নোটবন্দী'-র ঘোষণা এবং উপযুক্ত পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো ছাড়া প্রায় সমস্ত ধরনের পরোক্ষ করকে এক ছাতার তলায় এনে জি এস টি চালু করার পরিণতিতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্র, যেখানে রোজগেরে মানুষের সিংহভাগ (প্রায় ৯২-৯৩ শতাংশ) যুক্ত।

কালো টাকা উদ্ধার আর সন্ত্রাসবাদ দমনের বাগাড়ম্বরকে ধুলিসাৎ করে 'নোটবন্দী' ও 'জি এস টি'-র জোড়া ধাক্কায় যখন দেশীয় অর্থনীতি খোঁড়াতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই শুরু হয়েছে কোভিডের সংক্রমণ। কোভিড পর্ব শুরু হতেই মোদি সরকারের নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক জনসমক্ষে এসেছে। প্রথম অঙ্কের তুলনায় দ্বিতীয় অঙ্ক আরও জমকালো। এই অঙ্কে এসেছে মহাভারতের যুদ্ধের গল্প, থালা বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো এবং সর্বোপরি দু'মাসের বেশি সময় ধরে চাপিয়ে দেশজোড়া টানা লকডাউন। নোটবন্দীর মতোই 'লকডাউন'-এর ঘোষণাও হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গীতে এবং হঠাৎ। নোটবন্দীর ফলে নগদ লেনদেনের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের নাভিঃশ্বাস উঠেছিল। বহু মানুষ কাজ হারিয়েছিল। এ টি এম-র লাইনে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্তরও যখন গলদঘর্ম অবস্থা, তখন ডিজিটাল ট্রানজাকশনের গুনগান কীর্তন করে মধ্যবিত্তকে বোঝানো হল, যা করা হয়েছে, তা দেশ ও দশের মঙ্গলের জন্যই করা হয়েছে। কিন্তু নোটবন্দী যদি সাধারণ ঘূর্ণিঝড় হয় (পাকা বাড়ি রক্ষা পেল, কাঁচা বাড়ির চাল উড়ে গেল), 'লকডাউন' এল 'আমফান'-এর গতিতে। কাঁচা বাড়ি তো ধ্বসলোই, পাকা বাড়ির ছাদের জলের ট্যাঙ্ক, গাছের টব উড়ে গেল। জানলার বাহারী কাঁচও ফেটে চৌচির। মানে লকডাউনের ক্ষতি হল অনেক বড় আকারে। মোদি সরকারের এই 'মহাভারতীয়' চালে আগে থেকেই খুঁড়িয়ে চলা অর্থনীতি একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।

জনসমাজে লকডাউনের প্রভাবকে গণিতে 'সেট থিওরি'-র পরিভাষায় এইভাবে বলা যেতে পারে—গোটা সমাজটা যদি 'স্যাম্পল স্পেস' হয় তাহলে তার মধ্যে তিনটি সেট তৈরি হল। সব থেকে বড় সেটটি সমাজের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের সেট। যারা ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হল। দ্বিতীয় সেটটি হল মধ্যবিত্তের। যারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতির সম্মুখীন হল। আবার এই দুটি সেট গণিতের পরিভাষাতেই 'মিউচ্যুয়ালি ইনক্লুসিভ'। মানে দুটি সেটের একটা সাধারণ অংশ রয়েছে। মধ্যবিত্তের একটা অংশ নিয়মিত রোজগারের সুযোগ হারিয়ে নিম্নবিত্তের স্তরে নেমে যাওয়ার ফলেই এটা ঘটেছে। সর্বশেষ সেটটি হল, আকারে ক্ষুদ্রতম উচ্চকোটি মানুষের, যারা বহাল তবিয়তেই রইল শুধু নয়, অতিমারির মধ্যেই আরও হৃষ্টপুষ্ট হল। এই সেটটি অপর দুই সেটের সাথে সম্পর্কবিহীন, অর্থাৎ 'মিউচ্যুয়ালি এক্সক্লুসিভ'। লকডাউনের পর অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে বেড়িয়ে আসার জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত অংশের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। সিংহভাগ মানুষকে দুর্গতির তলানি থেকে টেনে তুলতে পারলে, তবেই চাহিদার অভাবে দেশীয় অর্থনীতির বেলাইন হয়ে যাওয়া চাকাটা, আবার লাইনের ওপর দিয়ে চলতে শুরু করতে পারত এবং ধীরে ধীরে গতিও বাড়াতে পারত। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ সহ বহু বিশিষ্টজন সেই মতো পরামর্শ দিলেও কর্পোরেট প্রেমে হাবুডুবু মোদি সরকারের কানে তা ঢোকেনি। ফল যা হবার তাই হয়েছে। এখন তো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাও এই ভ্রান্ত নীতির সমালোচনায় সরব হতে শুরু করেছে।

সাধারণ ধর্মঘট কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে মোদি সরকারের ক্রিয়া এবং বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই। মিডিয়ার টার্গেট যে বামেরা, তাদের কথা যদি বাদও দেওয়া হয়, তাহলেও সাধারণভাবে যারা বেসরকারিকরণ, উদারীকরণ ও বিশ্বায়নকে অর্থনীতির মহৌষধী বলে মনে করে, তারাও এখন এক বাক্যে বলতে শুরু করেছে, মোদি সরকার হাতুড়ে চিকিৎসকের মতো ঐ মহৌষধের ওভারডোজ অর্থনীতির শরীরে প্রয়োগ করেছে। ফলে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ সব জমা হয়েছে মাথায়, আর হাত-পাগুলো 'রিকেট' রোগের শিকার হয়েছে। একটু-আধটু ভিটামিন বড়ি (নগদ অর্থ, বিনামূল্যে খাদ্যশস্য) খাইয়ে রিকেটগ্রস্ত হাত-পাগুলোয় একটু জোর ফেরানো দরকার। কারণ ভারি মাথা আর লিকলিকে হাত-পা নিয়ে এগোতে গেলে, উল্টে পড়ার আশঙ্কা তো থাকেই।

তার মানে রোগটা যে বেশ জেঁকে বসেছে, তা নিয়ে সম্ভবত এখন আর তেমন কোনো বিতর্ক নেই। কারণ রামমন্দির, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা, সেন্ট্রাল ভিস্তা ইত্যাদি প্রসাধনী চাপিয়েও এখন বেকারি, দারিদ্র, অসাম্য ও ক্ষুধার ধাক্কায় ধুঁকতে থাকা অর্থনীতির ফুটি-ফাটা চেহারাটা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। তাই আগামী ২৮-২৯ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের দাবিগুলির ওপর চোখ রাখলে বোঝা যাবে, বাম মধ্য-দক্ষিণ সব মহলের বিশেষজ্ঞরাই যে কথা এখন বলছে, শ্রমিক কর্মচারীরাও তাদের মতো করেই দাবিসনদে একই কথা বলেছে। তবুও শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘট নিয়ে আপত্তি উঠবে। বস্তাপচা পদ্ধতি, কর্মনাশা ইত্যাদি বলে জোরদার সমালোচনাও হবে। এর অর্থ হল, রোগ রয়েছে, তা সবাই মানছে। এর নিরাময় দরকার, তা নিয়েও কোনো দ্বি-মত নেই। অথচ নিরাময়ের দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীরা (যে অংশ রোগগ্রস্ত অর্থনীতির জন্য সব থেকে বেশি আক্রান্ত) ধর্মঘট করলেই আপত্তি।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ালো এরকম যে, একজন বিশেষজ্ঞ মেধাকে ব্যবহার করে ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে, তার সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার 'কলম'টিকে ব্যবহার করে পাতার পর পাতা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখলে, আপত্তির কোনো কারণ নেই। কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে (মেধাজীবীদের বড় অংশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই) পুঁজি করে, তাদের হাতে থাকা সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্রটিকে (ধর্মঘট) ব্যবহার করলেই যত আপত্তি! এটা কি একধরনের স্ব-বিরোধিতা নয়?

এর উত্তরে কেউ কেউ বলতে পারেন, ধর্মঘটটাই করতে হবে কেন? অন্যান্যভাবে প্রতিবাদও তো করা যায়। তা যায় বৈকি। এবং তা হচ্ছেও। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সু-পরামর্শ যেমন মোদি সরকারের কানে ঢুকছে না, তেমনই প্রতিবাদের অন্যান্য পদ্ধতিও দু'কান কাটা সরকারকে নয়া উদারবাদী রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ ধর্মঘট তো বছরে মাত্র একদিন বা দু'দিনের। বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ তো চলছে সারা বছরই। তাতে কি কেন্দ্রীয় সরকার আত্ম-সংশোধন করেছে? প্রতিবাদী শ্রমিক-কর্মচারীদের কথায় গুরুত্ব দিয়েছে? কোনো সংশোধনীমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? না, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যেমন উপেক্ষিত হয়েছে, তেমনি উপেক্ষিত হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতিবাদের অন্যান্য ফর্মও। এই পরিস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী অস্ত্রগুলি লক্ষ্য পূরণে সফল না হলে, সর্বাধিক শক্তিশালী অস্ত্রটিকে ব্যবহার করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে কি?

ধর্মঘট মানে স্বেচ্ছায় শ্রম প্রদানে বিরত থাকা। শ্রমের বিনিময়ে যে মজুরি পাওয়া যায় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা উপযুক্ত পরিমাণে নয়) তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা। পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন একদিন বা দু'দিনের জন্য থমকে যাওয়া। এতে টাকার অঙ্কে কিছুটা ক্ষতি হয় ঠিকই। কিন্তু সমগ্র শ্রমশক্তির একটা বড় অংশকে কর্মহীন রেখে, মোট উৎপাদন ক্ষমতাকে ব্যবহার না করার ফলে প্রতিদিন যে ক্ষতি হচ্ছে, তার তুলনায় এই ক্ষতি কতটুকু? যদি ২৮-২৯ মার্চ ধর্মঘট না হত, তাহলেও কি ঐ দু'দিন দেশের কর্মক্ষম সব মানুষ হাতে কাজ পেতো? যারা কাজ পেতো তারাও কি উপযুক্ত মজুরি পেতো? হাট-বাজার বন্ধ না থেকে খোলা থাকলেও কি সুলভে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারতো? যানবাহন চলাচল অব্যাহত রাখার জন্য যে জ্বালানির প্রয়োজন, তা কি কম দামে পাওয়া যেত? এর কোনোটাই হত না।

ফলে ধর্মঘট না হলেও, দেশীয় অর্থনীতিতে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলার কোনো উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করবে না। কারণ এর জন্য সরকারকে যে যে পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হবে (যা বিশেষজ্ঞরাও বলেছে, আবার শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি সনদেও রয়েছে), তা কর্পোরেট শিবিরের মনপসন্দ নয়। স্বভাবতই কর্পোরেটদের চটিয়ে সাধারণ মানুষের ভালো করবে মোদি সরকার—এমন আশা দুরাশা মাত্র।

এমতাবস্থায় সজোরে ধাক্কা মেরে সরকারের সম্বিৎ ফেরানোই একমাত্র পথ। কৃষকরা ইতোমধ্যেই একটি ধাক্কা মেরেছে। এবার পালা শ্রমিক-কর্মচারীদের। এই জোড়া ধাক্কাই পারবে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের পায়ের তলার মাটিটাকে নড়িয়ে দিতে। মিডিয়া মিডিয়ার কাজ করুক। বিশেষজ্ঞগণ পক্ষে-বিপক্ষে চুলচেরা বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা জারি রাখুক। শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের প্রধান অস্ত্রটিকে শান দিয়ে পথে নামুক। নিজেদের জীবন ও জীবিকাকে রক্ষা করার পথ শ্রমিক কর্মচারীরা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই চিনতে শিখেছে। সু-পরামর্শের মোড়কে পেশ করা অন্য কারও কু-পরামর্শের কোনো প্রয়োজন শ্রমিক-কর্মচারীদের নেই। □

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

শোকসংবাদ

রতন ভাস্কর

গত ২৭ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ২০২২ আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন জেলার শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতা রতন ভাস্কর। সত্তর দশকে ছাত্র ও যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরে ন্যূনতম পরিদর্শক পদে চাকুরিতে যোগদানের পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন, ক্রমে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতায় তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক পদে আসীন হন। পরে দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, মালদা জেলা শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করেন। একই সাথে দীর্ঘ সময়ব্যাপী জেলার শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীদের যুক্তমঞ্চ, ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রতিপালন করে গেছেন। শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থায় এবং আপোসহীন সংগ্রামী মানসিকতায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন জেলার শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীদের একান্ত আপনজন; ছিলেন জেলার কর্মচারী আন্দোলন তথা বামপন্থী আন্দোলনের একজন বরিষ্ঠ অভিভাবক।

প্রয়াত নেতার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি, ১২ই জুলাই কমিটি ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব সহ সাধারণ কর্মচারীরা তাঁর বাসভবনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মরদেহ কর্মচারী ভবনে আনা হলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বর্ষীয়ান নেতা সমর রায়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অম্বর মিত্র, জামিল ফিরদৌস, কৌশিক মিশ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ১২ই জুলাই কমিটির নেতা শশাঙ্ক নাগ, দীপক পাল মজুমদার, বরুন চক্রবর্তী সহ কর্মচারী সংগঠনের নেতা সুবীর রায়, প্রদীপ বাগিড়া, প্রশান্ত ঝা, নবীন দাস, নিরঞ্জন প্রামানিক, নির্মল দাস সহ বহু নেতৃত্বকর্মী ও অসংখ্য গুনগ্রাহীরা শেষ শ্রদ্ধা জানান। সাথে সাথে সকলে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, একমাত্র কন্যা, জামাতা সহ অসংখ্য কর্মী-নেতৃত্ব ও সংগঠকদের। □

আবদুর মান্নাফ

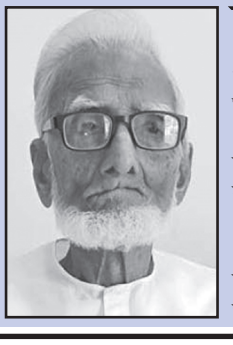

রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রথম যুগের সংগঠক ও পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড আবদুর মান্নাফ গত ২৬ জানুয়ারি ২০২২ বুধবার গভীর রাতে স্বল্পকালীন অসুস্থতার পরে প্রয়াত হয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর।

কমরেড মান্নাফের জন্ম ১৯২৪ সালে। গত শতাব্দীর চারের দশকে উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাঁর চাকরি জীবনের সূচনা। শুরু থেকেই তিনি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত করার কাজে নিজেকে যুক্ত করেন। অবিভক্ত বাংলার খাদ্য বিভাগের কর্মচারীরা তখন স্থায়ীকরণ ও চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলন করে যাচ্ছেন। ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারিগর ছিলেন তিনি। এই সমিতি গঠনের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি ১৬-১৭ নম্বর কলেজ স্ট্রিটে নিজের ব্যবহারের কক্ষটিকে (রুম নম্বর ৫০) সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তর হিসাবে ব্যবহারের জন্য দিয়ে দেন। খাদ্য বিভাগে ছাঁটাইবিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের জন্য তাঁকে নানা প্রশাসনিক নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছে। কর্মচারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাঁকে বদলিও করা হয়। স্বাধীন ভারতে ১৯৫৮ সালে অরবিন্দ ঘোষ সহ রাজ্য সরকারি কর্মচারী আন্দোলনের যে ২৫ জন সংগঠককে এ রাজ্যের তৎকালীন সরকার বরখাস্ত করে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড আবদুর মান্নাফ। ১৯৬৭ সালে রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আবদুর মান্নাফও চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছিলেন। ১৯৭৬ সালে আরামবাগে বদলে হলে তিনি সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সময়ে বেশ কিছুদিন আরামবাগ মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৮৩ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

কমরেড মান্নাফের মৃত্যু সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামানিক এবং ওই সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী। □

গণতন্ত্রের শিক্ষা

কৃষি আইন থেকে সরকারের পিছিয়ে আসাকে, গণতন্ত্রের প্রতি কৃষকদের দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৯ নভেম্বর, ২০২১ তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করার পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কৃষি আইন বাতিল সংক্রান্ত খসড়া আইন, ২০২১ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে পেশ করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, শাসকদলের পক্ষ থেকে এতদিন যারা আদা জল খেয়ে কৃষকদের প্রতিবাদের বিরোধিতা করছিল এবং বিভিন্ন ভাবে বিদ্রূপ করছিল, তাদের সহ অনেককেই বিস্মিত করেছে। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিবাদ আন্দোলন যা ৭০০-র বেশি কৃষকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং আরও অনেককেই হিংস্র সরকার, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও অতিমারির কারণে ভয়াবহ যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছে, আইন বাতিলের মাধ্যমে তার পরিসমাপ্তি নিশ্চিতভাবেই স্বাগত জানানোর মতো ঘটনা।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার পক্ষ থেকে তাঁকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, সংসদে আইনসম্মতভাবে কৃষি আইন বাতিল না করা পর্যন্ত এবং তাঁদের অন্যান্য দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, এম এস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (মোট উৎপাদন খরচ + ৫০% অতিরিক্ত) ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনী নিশ্চয়তা প্রদান; বিতর্কিত বিদ্যুৎ (সংশোধনী) খসড়া আইন ২০২১ বাতিল করা; জাতীয় রাজধানী অঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল ভিত্তিক বাতাসের বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শাস্তিমূলক আইন প্রত্যাহার। এছাড়াও রয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যের আন্দোলনরত কৃষকদের বিরুদ্ধে রুজু করা একাধিক মামলা প্রত্যাহারের দাবি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যিনি তাঁদের মতে লখিমপুর খেরি গণহত্যার জন্য দায়ী, তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ এবং গ্রেপ্তার করার দাবি।

প্রতিষ্ঠানপন্থী মিডিয়া গোষ্ঠী, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা এবং কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার ঘটনাকে গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে জাহির করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। যদিও সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা তাদের চিঠিতে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি, কিছুটা ক্ষোভের সাথে এও জানিয়েছে যে, ১১ দফা আলোচনার পরেও কোনো দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতায় না পৌঁছে, হঠাৎ করেই একতরফা ঘোষণা দুর্ভাগ্যজনক। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—আইন বাতিল করার ঘোষণার আগে, প্রধানমন্ত্রী যে দীর্ঘ মুখবন্ধমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন—তাতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, আইনগুলি উপকারী হওয়া সত্ত্বেও এবং এই বিষয়ে কৃষকদের জানানোর পরেও, তিনি আইনগুলি বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী গণতন্ত্রের 'বোঝা' জ্ঞান ও যুক্তিকে টেক্কা দিল। এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, ২০২২-এর প্রথম দিকে অনুষ্ঠিতব্য পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন এই সিদ্ধান্তের একটি কারণ। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং নির্বাচনী পাটিগণিতের সাথে একে সম্পূর্ণ মিশিয়ে ফেললে গণ্ডগোল হয়ে যাবে। যদি ক্ষমতাসীন সরকারের কাছ থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং নির্বাচকমণ্ডলীর দায়বদ্ধতার প্রত্যাশা থাকে, তাহলে এটা কি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ারও মৌলিক অন্তর্বস্তু নয়? প্রকৃত প্রস্তাবে, এটাই উপযুক্ত সময় যখন গণতন্ত্রের ধারণাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা প্রয়োজন। একদিকে সরকার যখন বিষয়টিকে একটি কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন কৃষকরা জোরের সাথে জানিয়েছে যে তারা কমিটি নয়, কমিটমেন্ট (দায়বদ্ধতা) চায়। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের ভূমিকায় যেমন দায়বদ্ধতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে, তেমনই বিপরীত দিকে কৃষকরা লাগাতার আন্দোলনে যুক্ত থেকে দায়বদ্ধতার ব্যাকরণকে চমৎকার অনুসরণ করেছে।

মধ্যবর্তী পর্বে, রাকেশ বৈষ্ণব এবং অন্যান্য বনাম কেন্দ্রীয় সরকার এবং অন্যান্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যখন আইনগুলির ওপর স্থগিতাদেশ জারি করে একটি কমিটি গঠন করে দেয় এবং কৃষকদের শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করে, তখন কৃষকরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বিদ্যমান পরিস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আবার একটি কমিটির ফাঁদে পা না দিয়ে, তারা সরাসরি সরকারের সাথে আলোচনার দাবি জানায়।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে কৃষকরা বাস্তব পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সম্ভাবনার বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সি এ এ)—জাতীয় নাগরিকপঞ্জী বিরোধী আন্দোলন—যা কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের সংঘবদ্ধতা—তা থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষকরা সুচিন্তিত বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলেছে। ২৬ জানুয়ারির ট্রাক্টর মিছিলের সময় ঘটে যাওয়া অনভিপ্রেত ঘটনাবলীর পরেও, কৃষকরা যে দৃঢ়তা ও দ্রুততার সাথে প্রতিবাদ স্থল পুনর্দখল করেছে তা প্রশংসনীয়। শাহিনবাগে সি এ এ বিরোধী আন্দোলন, অন্যান্য কারণের পাশাপাশি লকডাউনের জন্যও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষকরা তাদের আন্দোলনের কেন্দ্রটিকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।

যদি সরকার প্রকৃতই আগ্রহী হয়, তাহলে কমিটি গঠন ইত্যাদি অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে, আন্তরিকভাবে কৃষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আলোচনা এখন বিশেষ জরুরি। নির্বাচন এবং যৌথ স্বার্থরক্ষার বিষয়ে এই আন্দোলন জরুরী শিক্ষা দিয়ে গেল।

গণতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ থেকে কৃষকরা যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার একটি ব্যাকরণসম্মত শিক্ষা আমরা কৃষকদের কাছ থেকে পেলাম। বাস্তবতা থেকে সৃষ্ট দায়বদ্ধতার সাহায্যে বহুমাত্রিক বিভিন্নতা যেমন, কৃষক ও ক্ষেতমজুর জাত, শ্রেণী, লিঙ্গ ইত্যাদি বিভাজনকে তারা প্রতিনিয়ত মোকবিলা করেছে। অনুসৃত হয়েছে সমৃদ্ধি সম্পর্কিত এক দৃষ্টিভঙ্গী, যা বিভেদমূলক নয়, যৌথ এবং অংশীদারিত্বমূলক। অর্থনীতি কোনো সফট্ওয়্যার নয়, যার পুনর্নবীকৃত সংস্করণ প্রয়োজন; এর ভিত্তি হল মানুষের শ্রমদান, বেঁচে থাকা এবং জীবনকে গড়ে তোলা। যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেক একটি বিশেষ পেশায় যুক্ত, সেখানে তাদের দাবি এবং বিচক্ষণতাকে উপেক্ষা করার অর্থ হল নৈতিক বিশ্বাস ভঙ্গ। যদি বিনিয়ন্ত্রিত কৃষি অর্থনীতিকে কৃষকরাই বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে, তবে বুঝতে হবে বড় ধরনের গোলমাল রয়েছে। কৃষি আইন বাতিলের ঘোষণা, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটা গলদকে দেখিয়ে দিয়েছে—সংসদে আলোচনা অপেক্ষা একটিমাত্র একপাক্ষিক ঘোষণা যেখানে বেশি গুরুত্ব পায়। যদি এই ধরনের একপাক্ষিকতা 'সর্বসম্মত' সিদ্ধান্তকে নির্ধারণ করতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সাধারণ নাগরিকরাও এই পথ অনুসরণ করলে আমরা বিস্মিত হব না। □

[সূত্র ঃ সম্পাদকীয়, ই পি ডব্লু, নভেম্বর ২৭, ২০২১
অনুবাদ ঃ সুমিত ভট্টাচার্য]

আগামী ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ অনুষ্ঠিতব্য

সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দাবিসমূহ

১. বকেয়া ২৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান করতে হবে ও রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে

২. শ্রমকোড বাতিল কর

৩. কৃষি আইন বাতিলের পরবর্তীতে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা প্রদত্ত ৬ দফা দাবি মানতে হবে।

৪. বেসরকারীকরণ সম্পূর্ণ বন্ধ কর এবং ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপ'লাইন বাতিল কর।

৫. আয়কর আওতার বাইরে থাকা প্রতিটি পরিবারকে খাদ্য ও মাসিক ৭৫০০ টাকা নগদে অর্থ সাহায্য করতে হবে।

৬. এম এন রেগায় বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং শহরাঞ্চলেও এই প্রকল্পকে বিস্তৃত করতে হবে।

৭. সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অঙ্গনওয়ারি, আশা ও মিড ডে মিল সহ সমস্ত প্রকল্প কর্মীদের জন্য আইনানুগ ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. প্যানডেমিকের সময়ে মানুষের সেবার কাজে যুক্ত প্রথম সারির কর্মীদের সুরক্ষা ও বীমার সুযোগ প্রদান করতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের স্বার্থে ধনীদের ওপর সম্পদ করের মতো বিভিন্ন কর আরোপ করে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

১১. পেট্রোপণ্যে কেন্দ্রীয় করের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করতে হবে এবং মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১২. চুক্তিভিত্তিক ও প্রকল্প কর্মীদের নিয়মিতকরণ ও সমকাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে।

১৩. নয়া পেনশন প্রকল্প বাতিল করে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং এমপ্লয়িজ পেনশন স্কীমে বরাদ্দ প্রভূত বৃদ্ধি করতে হবে।

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী প্রতিপালন

কৃষি কারিগরী কর্মী সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে সমিতির ৬৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল কলকাতাস্থিত কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হল-এ গত ৫ অক্টোবর ২০২১ মঙ্গলবার। "বর্তমান ভারতে শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন ও গণমাধ্যমের ভূমিকা"—বিষয়ক এই আলোচনা সভায় মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহনতী মানুষের মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। সভার শুরুতে সমিতির সাধারণ সম্পাদক রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, প্রিয় সংগঠনের ১৯৫৬ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বিভাগীয় কর্মচারীদের বরখাস্ত করার প্রতিবাদে কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। পরবর্তীতে সংগঠনের লাগাতার আন্দোলনে সরকার বাধ্য হয় বরখাস্ত কর্মচারীদের ফিরিয়ে নিতে। কর্মচারীদের স্বার্থে সংগঠনের ৬৫ বছরের পথচলায় এ লড়াই জারি রয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্য তথা গোটা দেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সভার মূল আলোচক শ্রী দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন এদেশের বাণিজ্যিক গণমাধ্যমে কৃষক, শ্রমজীবী জনগণ, সংখ্যালঘু, আদিবাসীদের জীবন প্রতিফলিত হয় না, ক্রমশ বড় পুঁজির দখলে চলে যাচ্ছে মিডিয়া, বাড়ছে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণও। দক্ষিণপন্থা, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ এবং কর্পোরেট তোষণের পথে যাচ্ছে মিডিয়ার বড় অংশ। মিডিয়াই ভুয়ো খবরের উৎস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জাতীয় ক্ষেত্রের মতো পশ্চিমবঙ্গেও মিডিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ শাসকদলের কথায় চলছে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অমিতাভ সাহা। সভার শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সমিতির সদস্য সুমন চট্টোপাধ্যায়। সভায় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সদস্য ও ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের নেতৃত্ব সহ শতাধিক কর্মচারী সদস্যবন্ধু উপস্থিত ছিলেন। □

ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার এ্যাসো.-এর ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী

শোকসংবাদ

ওয়াসিম কাপুর

গত ২৪ জানুয়ারি ২০২২ নিজের বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চিত্রশিল্পী ওয়াসিম কাপুর। তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৫১ সালে লখনউতে জন্মেছিলেন। লখনউয়ে জন্ম হলেও কলকাতা ছিল তাঁর কর্মভূমি। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও সমাদৃত হয়েছে তাঁর চিত্রশিল্প।

মাত্র ছ'বছর বয়সেই খাট থেকে পড়ে পায়ে বড় মাপের চোট পেয়েছিলেন ওয়াসিম। ১৫ বছর বয়স অবধি বিছানাতেই কেটে যায় তাঁর শৈশব ও কৈশোর জীবন। পা বাঁধা ছিল প্লাস্টারে, কিন্তু ওয়াসিমের মন উড়ান দিত বাড়ির জানলা দিয়ে। হাসপাতাল আর বাড়ি এই ছিল তাঁর রুটিন। এরই মাঝে বাবার কাছে আবদার ছিল আঁকা শেখার। শখ পূরণে খামতি রাখেননি বাবাও। বিছানায় শুয়েই শুরু আঁকা শেখা, শৈশবে তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন অমর নন্দন। তিনিই তাঁকে ১৫ বছর বয়সে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দেন। ক্রাচ হাতেই কলেজে যাওয়া শুরু কিশোর ওয়াসিমের। এরপর যামিনী রায়, মকবুল ফিদা হুসেন, দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর মতো প্রখ্যাত শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসেন ওয়াসিম কাপুর। কলেজের শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবি জায়গা করে নেয়। ধীরে ধীরে দেশের বাইরেও শিল্পকর্মের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিধানসভায় জ্যোতি বসুর তৈলচিত্র এঁকেছিলেন বাম মানসিকতার এই চিত্রশিল্পী। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা থেকে শুরু করে ভারতের সংসদ ভবন, উর্দু অ্যাকাডেমি, ললিতকলা অ্যাকাডেমি—নানা জায়গায় তাঁর আঁকা ছবি স্থান পেয়েছে। ওয়াসিম কাপুরের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিল্পীমহলে। □

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের তাৎপর্য

মানস কুমার বড়ুয়া

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের অভূতপূর্ব সাড়া জাগানো কৃষক আন্দোলনের জয় ঘোষিত হয়েছে বিগত ১১ ডিসেম্বর ২০২১। এই জয় তাৎপর্যপূর্ণ কারণ কর্পোরেট মৌলবাদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ এবং সাম্রাজ্যবাদের কার্যত এর দ্বারা পরাজয় সূচিত হয়েছে। এক বছর পনেরো দিন ধরে কৃষকদের দেশব্যাপী অত্যন্ত শক্তিশালী আন্দোলন ব্যাপ্তিতে ছিল বৃহত্তম, দৈর্ঘ্যে ছিল দীর্ঘতম, যা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীতেও একটি ইতিহাস রচনা করেছে। এই আন্দোলনের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা থেকে শুধু কৃষক সমাজ নয়, দেশের শ্রমজীবী সকল অংশের মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করা প্রয়োজন। বিশেষত কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের আহ্বানে আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ দেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হবে তার প্রস্তুতি ও প্রচারে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের নানাবিধ শিক্ষা অবশ্যই কার্যকরী হবে।

এক বছরের অধিক সময় ব্যাপী ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। পাঁচশোর বেশি কৃষক সংগঠনের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া 'সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা' (এস কে এম) এই ধারাবাহিক জঙ্গী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন মতের এতগুলি সংগঠন কোনো আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অতীতে কখনও এইভাবে জোট বাঁধতে পারেনি। কৃষক সমাজের বড় অংশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল দিল্লী সীমান্তেই শুধু নয়, গোটা দেশে। আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল ক্ষেতমজুর থেকে গরিব ও মাঝারি কৃষকরা। যুক্ত হয়েছিল ধনী কৃষকদের একটা অংশও। কৃষক সমাজের বিভিন্ন অংশের এত দীর্ঘ সময় ধরে অনড় মনোভাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এক ছাতার তলায় আন্দোলন দেশের শাসকশ্রেণীকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল এবং মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিল।

এই আন্দোলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। সমগ্র আন্দোলনকেই সম্পূর্ণ সমর্থন যুগিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ। বাস্তবে এই লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল শ্রমিক কৃষকের যৌথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ২৬ নভেম্বর ২০২০ 'দিল্লি চলো'-র ডাক দিয়েছিল ঐক্যবদ্ধভাবে সারা দেশের কৃষক সমাজ এবং শ্রমিকশ্রেণী। তারপর থেকে নানা যৌথ অথবা একক কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশজুড়ে রাস্তায় নেমেছিল শ্রমিকশ্রেণী এই আন্দোলনকে সংহতি জানিয়ে। বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের উপর নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। টিয়ার গ্যাস, জল কামান, রাস্তা কেটে দেওয়া, কাঁটা তারের ব্যারিকেড, লাঠি চার্জ, অসংখ্য গ্রেপ্তার, ভুয়ো পুলিশ কেস এমনকি একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পুত্রের গাড়ি চাপা দিয়ে কয়েকজন কৃষককে খুন করা ইত্যাদি নানা কায়দায় ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালানো হয়েছে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর। কিন্তু এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে কোনোভাবেই দমানো যায়নি। সংগ্রামরত অবস্থায় বিগত এক বছরে ৭১৫ জনেরও বেশি কৃষক শহীদ হয়েছেন। এই অনমনীয় ও অনড় মনোভাব এই আন্দোলনের সাফল্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রতিপালন করেছে।

এই সংগ্রামকে নানাভাবে অপবাদ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে শাসকশ্রেণীর, বিশেষত বিজেপি-আর এস এস-এর পক্ষ থেকে। অপপ্রচার করে বলা হয়েছে কৃষকদের আন্দোলনে মদত দিচ্ছে, খালিস্তানী, মুসলমান, মাওবাদীরা, এমনকি পাকিস্তান ও চীনের মদতের কথাও বলা হয়েছে। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত 'গদি মিডিয়া' এইসব প্রচার করে কৃষক আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে। কিন্তু কৃষকদের সংগ্রাম এই ধরনের সব অপপ্রচারকে প্রতিহত করে তাদের অবস্থানে দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিক আন্দোলনকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের সর্বোচ্চ বিপর্যয় কোভিড অতিমারির বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। এর পূর্বে ২০১৯-২০-তে সি এ এ, এন আর সি, এন পি আর-এর বিরুদ্ধে যখন ব্যাপক গণআন্দোলন চলছিল, তাকে দখল করতে সরকার এই কোভিড অতিমারিকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিল। কিছুটা সফলও হয়েছিল। কৃষকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অতিমারির আবহে এবং অতিমারির ভয়াবহ দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেও তাদের সংগ্রাম অনমনীয় ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার অতিমারিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কৃষি আইন কার্যকর করার যে কৌশল নিয়েছিল তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে কৃষকদের অপরাজেয় মনোভাব। সরকার ভেবে নিয়েছিল যে, কোনো প্রতিরোধ এই সময়ে হবে না। কৃষকরা এই চক্রান্ত বা কৌশলকে ব্যর্থ করেছে।

আন্দোলনরত কৃষকদের উত্যক্ত করে হিংসাত্মক পথে নিয়ে যেতেও নানা চক্রান্ত চলেছে বিগত এক বছর ধরে। ২৬ জানুয়ারি ২০২১ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন যে ট্রাক্টর মিছিলের কর্মসূচী ছিল, সেই সময় শাসকশ্রেণী ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাদের এজেন্ট এবং পুলিশ বাহিনীকে প্ররোচনা সৃষ্টি করতে ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের অপকৌশলকে ব্যর্থ করেছে কৃষকরা।

৩৮০ দিন ধরে চলা এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই

আন্দোলন ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের প্রতীক। দিল্লির বুকে শুধু নয় গোটা দেশজুড়ে এই আন্দোলন ছিল ধর্ম, জাত, আঞ্চলিকতা ও ভাষাগত ভিন্নতার উর্ধ্বে। এই আন্দোলনে যুক্ত ছিল পুরুষ, নারী, যুবক ও বৃদ্ধরা। লিঙ্গ বা বয়সজনিত কোনো বৈষম্যও এই আন্দোলনে প্রভাব ফেলেনি। বিশেষত নারী ও যুবদের অংশগ্রহণ ছিল অভূতপূর্ব। আন্দোলনের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র এবং নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের সুর, আন্দোলনকে ব্যর্থ করার সব ধরনের প্রয়াসকে নস্যাৎ করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষক আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল পাঁচশোর উপর নানা ধরনের কৃষক সংগঠনের একটি কৃষি আইন বিরোধী আন্দোলন ক্রমশ একটি রাজনৈতিকভাবে সচেতন আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল। কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় স্তরে নির্বাচন এবং হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানে উপ নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ে কৃষক আন্দোলনের প্রভাব প্রতক্ষ্য অথবা পরোক্ষভাবে ছিল। এর প্রভাবে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-আর এস এস ব্যাকফুটে চলে গেছে এবং রক্ষণাত্মক কৌশল নিতে বাধ্য হয়েছে। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা মিশন উত্তরপ্রদেশ-উত্তরাখণ্ড শ্লোগান দিয়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষের সুবিশাল জমায়েত করেছে মুজফ্ফরনগরে।

সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন মূলত তিনটি দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। প্রথম দাবি ছিল সেপ্টেম্বর ২০২০-তে সংসদে গৃহীত তিনটি কৃষক স্বার্থবিরোধী, জনবিরোধী এবং কর্পোরেটপন্থী কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত ন্যূনতম সংগ্রাহক মূল্য নিশ্চিত করতে এবং উৎপাদন খরচের ন্যূনতম দেড়গুণ সংগ্রহ মূল্য নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে। যার সুপারিশ করেছিল ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে জাতীয় কৃষক কমিশন। তৃতীয়ত বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী প্রত্যাহার করতে হবে। কৃষক আন্দোলন মূলত এই দাবিসমূহকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও পরবর্তীকালে আন্দোলন থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়েই ক্রমে তা নয়া উদারনীতি এবং সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়ে ওঠে। আন্দোলনের নেতৃত্ব সঠিকভাবেই শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল বিজেপি-আর এস এস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ও দেশি বিদেশী কর্পোরেট লবির আঁতাতকে যা কর্পোরেট মৌলবাদ হিসাবে বর্তমানে পরিচিত।

প্রবল ঠাণ্ডা, ঝড়, বৃষ্টি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়াই করেই এক বছরের বেশি সময়জুড়ে শাসকের চোখে চোখ রেখে দিল্লী সীমান্তে কৃষকরা অবস্থান করেছে। কোনো বাধা, প্ররোচনা, প্রলোভন তাদের লক্ষ্য থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে গোটা দেশের কৃষক সমাজই শুধু নয়, অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষও। দিল্লী ঘেরাও দিয়ে যে আন্দোলনের সূচনা, পরবর্তীকালে সেই আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে একে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ দিয়েছে। দেশজুড়ে এক বৎসরের অধিক সময় ধরে চলা এই ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ কৃষক আন্দোলনের এই ধরনের নানা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। যা থেকে গণআন্দোলন ও শ্রেণী আন্দোলনকে অবশ্যই শিক্ষাগ্রহণ করে আগামী দিনের সংগ্রামে ব্যবহার করতে হবে।

১৯ নভেম্বর ২০২১ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তিনটি কৃষি বিল ফিরিয়ে নেবার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন আন্দোলনের চাপে। ২০ নভেম্বর ২০২১ সংসদের দুটি সভা থেকেই সরকারীভাবে তিনটি কৃষি বিল ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ২ ডিসেম্বর, ২০২১, ভারতের রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দেন। ১৯ নভেম্বর ২০২১ প্রদানমন্ত্রীর ঘোষণা থেকে ২ ডিসেম্বর ২০২১ রাষ্টপতির স্বাক্ষর পর্যন্ত সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা কেন্দ্রের সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ বজায় রেখেছিল কোনোরকম আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ না রেখে। কারণ কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব শুধু প্রধানমন্ত্রীর মুখের কথায় স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বাস করতে চাননি। আরেকটি কারণ ছিল আন্দোলনের অভিঘাতে বা পরিণতিতে আন্দোলন থেকেই উদ্ভুত আরও কিছু দাবিরও মীমাংসা প্রয়োজনীয় ছিল। এই দাবিগুলির মীমাংসা চেয়ে ২১ নভেম্বর '২১ প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি পাঠানো হয় এস কে এম-এর পক্ষ থেকে। এই দাবিগুলি নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা করতে ৪ ডিসেম্বর '২১ পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে এস কে এম। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রথম দফার আলোচনার খসড়া প্রত্যাখ্যান করে উক্ত কমিটি। পরবর্তীকালে ৯ ডিসেম্বর '২১ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের বাকি দাবিগুলিকে প্রায় সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে পত্র পাঠানো হয় এস কে এম-এর কাছে। আন্দোলনে শহীদ ৭১৫ জন কৃষকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, আন্দোলনরত কৃষক, যাদের উপর নানা ধারায় মিথ্যা মামলা চাপানো হয়েছিল সেগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া, বিদ্যুৎ বিল সংশোধনী প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা—ইত্যাদি প্রস্তাব সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়ন করার সঙ্গত দাবিকে অস্বীকার করা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। এরপর কৃষক আন্দোলনের নেতারা বিবৃতি দিয়ে জানান যে আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে জয়ী হলেও সেই জয়কে কার্যকরী করার জন্য এবং অমীমাংসিত দাবিগুলির মীমাংসার জন্য লড়াই জারি থাকবে। অর্থাৎ অন্নদাতাদের যুদ্ধ জারি আছে যা এই আন্দোলনের একটা বড় শক্তি ছিল শ্রমজীবীদের অন্যান্য অংশের সমর্থন এবং অংশগ্রহণ। ২৬ নভেম্বর ২০২০ এই আন্দোলনের সূচনা হয় কৃষকদের সংসদ অভিযান এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। কৃষকদের সংসদ অভিযান পর্যবসিত হয়েছিল দিল্লী প্রবেশের ছয়টি সীমান্তে অনির্দিষ্টকালের কৃষক অবস্থানের কর্মসূচীতে। সেই দিনের সংসদ অভিযানের উপর হরিয়ানা পুলিশ ও দিল্লী পুলিশ নির্মম শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর নামিয়ে আনা হয়েছিল নৃশংশ অত্যাচার। যার পরিণতিতে অনির্দিষ্টকালের অবস্থান কর্মসূচীতে নামেন কৃষকগণ। এর পরবর্তীকালে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বারংবার নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে নানাধরনের যৌথ এবং একক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। যার মধ্যে ছিল কৃষকদের মহাপঞ্চায়েত এবং ট্রাক্টর মিছিল, শ্রমিক মিছিল, শিল্প, কারখানা ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী এবং ধর্মঘট। সর্বোপরি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ইত্যাদি কর্মসূচী।

কৃষক শ্রমিক যৌথ কর্মসূচীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০২১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ। আর্থিক ক্ষেত্রগুলিতে অফিসার ও কর্মচারীদের ১৫-১৮ মার্চ ২০২১, ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে ১৫, ১৬ মার্চ, জীবন বিমাতে ১৮ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট, ২৬ মে শ্রমিক-কৃষক যৌথভাবে কালাদিবস প্রতিপালন, রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ ও প্রতিরক্ষা অর্ডিনান্স-এর বিরুদ্ধে ২৩ জুলাই দেশজোড়া প্রতিবাদ কর্মসূচী, ৯ আগস্ট শ্রমিক-কৃষকদের যৌথভাবে 'দেশ বাঁচাও দিবস' পালন, ৫ সেপ্টেম্বর কৃষকদের ঐতিহাসিক মুজফ্ফরনগর মহাপঞ্চায়েত, যেখান থেকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বার্তা দেওয়া হয় ও 'মিশন উত্তরপ্রদেশ' ও 'মিশন উত্তরাখণ্ড' কর্মসূচী গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঐ দুটি রাজ্যে বিজেপি সরকারেক হটিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখ শ্রমিক-কৃষক যৌথভাবে ভারত বন্‌ধের কর্মসূচী প্রতিপালন করে। যৌথ আন্দোলনের সর্বোচ্চ কর্মসূচী হিসাবে ৩ নভেম্বর ২০২১ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আগামী বাজেট অধিবেশনের সময় দু'দিনের সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটে যাবার কথা ঘোষণা করে। যা আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ অনুষ্ঠিত হবে। একে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে সংযুক্তি কিষাণ মোর্চা বলেছে ঐদিন তারা গ্রাম ভারত বন্‌ধের উদ্যোগ নেবেন।

আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২-এর ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রায় সব সর্বভারতীয় ফেডারেশনসমূহ। নেই শুধু আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বি এম এস এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ট্রেডইউনিয়ন আই এন টি টি ইউ সি। দু'দিনের আশু সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হবে কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক সাফল্যের পটভূমিতে। নয়া উদারনীতি চালু হবার পর থেকে এটি ২১তম ধর্মঘট। এই ধর্মঘটের সামনে ইতিবাচক অনেক বিষয় আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল কৃষক আন্দোলনের সাফল্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তাকে কাজে লাগাবার সুযোগ এই ধর্মঘটের প্রচার আন্দোলনে ব্যবহার করবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নও। ইতিমধ্যেই কৃষক আন্দোলনের উত্তাপকে ব্যবহার করে ১৬-১৭ ডিসেম্বর ২০২১ ব্যাঙ্ক শিল্পের অফিসার ও কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধভাবে সফল ধর্মঘট করেছে। আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২-এর সাধারণ ধর্মঘটে প্রেরণা ও শক্তি হিসাবে কাজ করবে তাৎপর্যপূর্ণ ও সফল কৃষক আন্দোলন।

কৃষক আন্দোলন একটি সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে সেটা হল শাসক যতই স্বৈরাচারী হোক, তাকেও মেহনতী মানুষের ঐক্য, দৃঢ়তা, হার না মানা মানসিকতার কাছে মাথা নোয়াতে হয়। শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এর আগে পিছু হটেছে একাধিকবার। আন্দোলনের চাপে ৩১ মার্চ ২০২১ শ্রমকোডের প্রয়োগকে সাময়িক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। উল্লেখ্য ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে শ্রমকোড কার্যকরী হবার কথা ছিল। এর আগে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে আন্দোলনের চাপে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে আগস্ট ২০১৫-তে জমি অধিগ্রহণ বিল কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি সরকার। এরকম আরও কয়েকটি উদাহরণ আছে। কিন্তু এগুলি হল, স্বৈরাচারী শাসকের এক-পা বা দুই-পা পিছিয়ে যাওয়ার চিত্র। স্বৈরাচারী শাসককে প্রথমবার কার্যত হাঁটু গেড়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য করল অনমনীয় কৃষক আন্দোলন। যে সাহস, আত্মত্যাগ, ধৈর্য্যের পরকাষ্ঠা দেশের কৃষকরা দেখিয়েছে তার শিক্ষা গ্রহণ করেই আসন্ন দু'দিনের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করবে গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষ। এই সংগ্রামে সামিল হবেন এই রাজ্যের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। □

নভেম্বর বিপ্লব—একটি তাত্ত্বিক নির্মাণ

প্রণব কর

মানব ইতিহাসে 'নভেম্বর বিপ্লব' হল প্রথম বিপ্লব যা প্রথমে তত্ত্বগতভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তারপরে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল কিন্তু নভেম্বর বিপ্লব তাত্ত্বিকভাবে নির্মিত হয়েছিল। অনেকে একথাও বলার চেষ্টা করেন যে এটা কোনো বিপ্লব নয় বরং একটা 'ক্যু'— সামরিক অভ্যুত্থান। আসলে নভেম্বর বিপ্লব ছিল একটি তত্ত্বের বাস্তবায়ন—"theory burst into praxis"। লেনিন তৎকালীন অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক সঙ্কটকে সংজ্ঞায়িত করেছেন তাঁর বিখ্যাত 'Imperialism, the Highest stage of Capitalism' (1916) গ্রন্থে। তিনি এই গ্রন্থে দেখান যে পুঁজিবাদী-শৃঙ্খলের দুর্বলতাম স্থানে আঘাত করে শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলা যাবে আর তৎকালীন রাশিয়া হল এই শৃঙ্খলের দুর্বলতম স্থান। এই তাত্ত্বিক অবস্থানের দ্বারাই নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন হয়।

১৯১৭ সালের পূর্বে রাশিয়া-সাম্রাজ্য ছিল আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম সাম্রাজ্য— ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরেই। রাশিয়ার যে অংশে ইউরোপ ছিল, শুধুমাত্র সে অংশেই ১৯১৩ সালে ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষ বসবাস করতো, যা ছিল তৎকালীন ইউরোপের যে কোনো রাষ্ট্রের জনসংখ্যার থেকে বেশি। কিন্তু অর্থনৈতিক মানদণ্ডে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সব থেকে পশ্চাৎপদ এবং দরিদ্র রাষ্ট্র। সে সময়ে রাশিয়ার জনপ্রতি আয় ছিল ১০২ রুবল, যেখানে ইংল্যান্ডে তা ছিল ৪৬৩ রুবল, ফ্রান্সের ছিল ৩৫৫ রুবল এবং জার্মানির ছিল ২৯২ রুবল। রাশিয়া ছিল মূলত কৃষিপ্রধান দেশ— জাতীয় আয়ের ৫১.৩ শতাংশ আসতো কৃষি থেকে, যেখানে শিল্পের অংশ ছিল মাত্র ২৮ শতাংশ। যেখানে জার্মানিতে ১৯১৩ সালে কাঁচা লোহা উৎপাদন হত ১৬.৮ মিলিয়ন টন, সেই একই সময়ে রাশিয়ায় তা উৎপাদন হত ৪.৬ মিলিয়ন টন। রাশিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল আর মাত্র ২ শতাংশ মানুষ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জারের স্বৈরাচারী শাসন প্রক্রিয়া।

কিন্তু এই সকল পশ্চাৎপদতা সত্ত্বেও রাশিয়ায় শিক্ষার প্রসার ছিল বেশ ভালো। বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার সহ এক বিশাল বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতিতে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটেছিল বেশ ভালোভাবেই।

রাশিয়াতে প্রাথমিকভাবে নারদনিক মতবাদ বেশ জনপ্রিয় ছিল। এরা ছিলেন হারজেন (১৮১২-৭০)-এর অনুগামী। হারজেন মনে করতেন যে রাশিয়ার কৃষক পঞ্চায়েত বা কমিউনগুলিকে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভ্রূণে পরিণত করা যাবে। অর্থাৎ শোষণমূলক পুঁজিবাদী স্তরে প্রবেশ না করেই রাশিয়াকে সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটানো যাবে। ফলে নারদনিকরা এই ভুল ধারণা পোষণ করত যে একমাত্র কৃষকরাই প্রধান বিপ্লবী শক্তি, শ্রমিকেরা নয়। কৃষকদের কাছে তারা গেলেও, কৃষকদের সম্পর্কে যথার্থ ধারণা না থাকায় তারা কৃষকদের সমর্থন পেল না। ফলে তারা ব্যক্তিসন্ত্রাসের পথে অগ্রসর হল। লেনিন তার ''হোয়াট দ্যা ফ্রেন্ডস অব দ্যা পিপল আর'' (১৮৯৩) এবং ''ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া'' (১৮৯৯) গ্রন্থ দুটিতে নারদনিকদের মতাদর্শগতভাবে তীব্র আক্রমণ করেন। এরপর দ্রুত নারদনিকদের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

নারদনিকের ফেলে যাওয়া রাজনৈতিক স্থান পূরণ করতে উঠে আসে তিনটি ধারা—(১) পি.বি. স্ট্রুভ পরিচালিত 'লিগাল মার্কসিস্ট', (২) 'ইকোনমিজম' এবং (৩) জি. ডি. প্লেখানভের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি'। কালক্রমে তৃতীয় ধারাটিই সব থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (আর.এস.ডি.এল.টি. পি) ভিত্তি দৃঢ় করে ১৯০২ সালে লেনিন রচিত 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' বইটি। এই বইতে লেনিন পার্টির কাঠামো সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ছক এঁকে দেন। পার্টির গঠন সম্বন্ধে তিনি লিখলেন যে পার্টির দুটি অংশ থাকবে—(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় নিয়মিত কর্মীদের নিয়ে একটি ঘনিষ্ট চক্র, যাঁরা হবেন পেশাদার বিপ্লবী এবং (২) এমন পার্টি সভ্য, যাঁরা লক্ষ লক্ষ মেহনতকারি জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন ভোগ করেন। এই গ্রন্থে লেনিন লেখেন যে, ''আমাদের মতে সারা রুশ দেশের উপযোগী রাজনৈতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করাই হবে আমাদের কাজের আরম্ভ, আমাদের আকাঙ্খিত সংগঠন সৃষ্টির প্রথম ধাপ। সংবাদপত্র কেবল যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারীই নয়, সংবাদপত্র যৌথ সংগঠকও বটে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বইটি রচনার দু'বছর আগেই ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ইসক্রা' পত্রিকর প্রথম সংখ্যা বের হয় বিদেশে।

এই গ্রন্থে ইকোনমিজম বা অর্থনীতিবাদীদের তীব্র আক্রমণ করে লেনিন লেখেন যে, শ্রমিকশ্রেণিকে সাধারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে সরিয়ে রাখা এবং মালিক ও সরকার উভয়কেই অটুট অবস্থায় ছেড়ে মালিক ও সরকারের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কাজ সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হল শ্রমিকদেরকে চির দাসত্বের দণ্ডে দণ্ডিত করা।

এই বইটি প্রকাশের এক বছরের মধ্যেই অর্থনীতিবাদীদের মতাদর্শ একটি তিক্ত স্মৃতিতে পরিণত হয়ে গেল। এই বইতে যেসব তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হয়, তাই পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টির মতাদর্শের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

অর্থনীতিবাদীরা পরাস্ত হবার পর লেনিনের নেতৃত্বে পার্টির জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করার কাজ শুরু হয়। এক্ষেত্রে লেনিন ও প্লেখানভের মধ্যে গুরুতর মতভেদ তৈরি হল। লেনিন ভূমিস্বত্বকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার পক্ষে ছিলেন, কিন্তু প্লেখানভ এর বিরুদ্ধে ছিলেন, যদিও লেনিন বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবৃতি এবং সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব সম্বন্ধে

একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ঐ খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় এই কর্মসূচী এবং বিপ্লব পূর্ববর্তী সময়ে এটিই ছিল পার্টি কর্মসূচী (অষ্টম কংগ্রেস পর্যন্ত)।

১৯০৩ সালের ১৭ জুলাই বিদেশে গোপনে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই কংগ্রেসে লেনিন পার্টির সভ্য হবার জন্য তিনটি শর্ত পূরণের কথা বললেন। সভ্য হতে হলে—(১) পার্টির কর্মসূচী মানতে হবে, (২) পার্টিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে এবং (৩) পার্টির কোনো না কোনো সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু মারটভ, আক্সেলরভ, জাসুলিচ এবং ট্রটস্কির মতো নেতারা তৃতীয় শর্তটি কিছুতেই মানতে চাইলেন না। অর্থাৎ লেনিন যেখানে পার্টিকে দৃঢ় শৃঙ্খলার উপর দাঁড় করাতে চাইলেন সেখানে মারটভেরা চাইলেন সংগঠনের দিক থেকে পার্টি হবে আলগা ধরনের। ফলে কংগ্রেসে দেখা গেল যে সংগঠনের প্রশ্নে পার্টির মধ্যে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদই পার্টিকে বলশেভিক এবং মেনশেভিক এই দুই ভাগে ভাগ করে। বলশেভিকরা হলেন সাংগঠনিক নীতির পরিপোষক, আর মেনশেভিকরা হলেন সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও সুবিধাবাদের পরিপোষক।

মেনশেভিকরা যখন পার্টিকে আবার পুরনো সাংগঠনিক অনৈক্যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে এবং শৌখিন ও খামখেয়ালী কাজের পর্যায়ে টেনে নামাতে চেষ্টা করছিল, তখন এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যুক্তি শানিত করে লেনিন ১৯০৪ সালের মে মাসে তাঁর বিখ্যাত বই—"One step forward and two step Backward" প্রকাশ করেন। সংগঠনের যে প্রধান প্রধান নীতির ব্যাখ্যা লেনিন এই বইতে দিলেন তা পরবর্তীকালে বলশেভিক পার্টি সংগঠনের মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেগুলি হল—

(১) পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর একটি সাধারণ বাহিনী নয়, পার্টি হল শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী, শ্রেণি চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাহিনী। সুতরাং শ্রমিকশ্রেণি যা পার্টিও তাই—এই দুই ধারণা ভুল।

(২) কেউ ধর্মঘটে যোগ দিলেই সে নিজেকে পার্টিসভ্য বলতে পারবে, এই দাবি অনুচিত। ধর্মঘটীর চেতনাকে পার্টির রাজনৈতিক চেতনার স্তরে তুলে আনতে হবে।

(৩) পার্টির সব সভ্যকে একই বাহিনীতে সুসংহত থাকতে হবে। একই কর্মপন্থা ও শৃঙ্খলায় তারা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে থাকবে। শ্রমিকরা শৃঙ্খলা বা সংগঠনকে ভয় পায় না। শৃঙ্খলা বা সংগঠনকে ভয় পায় খামখেয়ালী বুদ্ধিজীবীর দল।

(৪) পার্টির বাইরে সাধারণ জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক না থাকলে এবং এই সম্পর্ক ক্রমাগত বাড়াতে এবং শক্তিশালী না করতে পারলে পার্টি বাঁচতে পারবে না বা বাড়তে পারবে না।

(৫) ঠিকমতো কাজ করতে হলে পার্টিকে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।

এই বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল এই যে, মার্কসবাদের ইতিহাসে লেনিনই সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণীর প্রধান সংগঠন রূপে পার্টির ভূমিকা সম্বন্ধে নীতি বিশ্লেষণ করলেন এখানেই। যে প্রধান হাতিয়ার না থাকলে একনায়কতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে সর্বহারা শ্রেণি বিজয়ী হতে পারে না। পার্টিকে সেই হাতিয়ার হিসেবে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন।

'One Step Forward and Two Step Backward' বইটি পার্টি-কর্মীদের মধ্যে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় স্থানীয় সংগঠনের বড় অংশটাই বলশেভিকদের পক্ষে এসে দাঁড়ালো। ফলে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরও প্রবল আকার ধারণ করল। ১৯০৪ সালে প্লেখানভের সাহায্যে মেনশেভিকরা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ক্ষমতা এবং ইসক্রা দখল করে নিল। ফলে বলশেভিকদের নিজস্ব তাত্ত্বিক পত্রিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ১৯০৫ সালের ৪ জানুয়ারি প্রকাশিত হল বলশেভিকদের সংবাদপত্র 'ডপেরিয়ড' (আগে চলো)। ইতোমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব কায়েম করা এবং চীন দেশকে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তীক্ষ্ণ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। একে কেন্দ্র করে রাশিয়া এবং জাপানের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। জাপানী সেনাবাহিনী জার সেনাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়। প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার জার সেনা মারা যায় বা জখম হয়ে বন্দী হয়। জাপানের সঙ্গে জার-সরকার অত্যন্ত অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হয়। রাশিয়ার জনসাধারণ এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চায়নি। যুদ্ধের ফলে জারতন্ত্রের উপর যে বিপুল ক্ষতির বোঝা চাপে তা তারা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে উদ্যত হয়। ফলে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহী জনগণ ধর্মঘটের পথে যায়। ১৯০৪ সালে বলশেভিকদের নেতৃত্বে বাকু শহরে শ্রমিকদের এক বিরাট ও সুসংবদ্ধ ধর্মঘট হয় এবং ধর্মঘটের মাধ্যমে শ্রমিকরা দাবি-দাওয়া আদায় করে নেয়। এই ধর্মঘটের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে শ্রমিকেরা অন্যত্রও ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেন্ট পিটার্সবার্গের ধর্মঘটী শ্রমিকরা তাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে ১৯০৫ সালের ২২ জানুয়ারি রবিবার জারের শীতপ্রাসাদের অভিমুখে নিরস্ত্র অবস্থায় মিছিল করে যেতে গেলে তাদের উপর গুলি চলে। এক হাজারের বেশি শ্রমিক গুলিতে মারা যায়। এই রক্তাক্ত পরিবারের ঘটনায় শ্রমিক শ্রেণি রাস্তায় নেমে এল ঘৃণা প্রকাশ করতে। রাশিয়ায় শুরু হল বিপ্লব। এর প্রভাবে সরকারি যুদ্ধ জাহাজ 'পোটেমকিন' পর্যন্ত বিপ্লবের পক্ষে চলে যায়। এই বিপ্লবের প্রকৃতি ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব।

এই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের কর্মকৌশলগত নীতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মেনশেভিকরা মনে করত যে এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে লিবারেল বুর্জোয়ারা। কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন না করে সর্বহারা শ্রেণীর উচিত লিবারেল বুর্জোয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। আর বলশেভিকরা বলেন যে, বিপ্লবের প্রকৃতি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হলেও মূলত সর্বহারা শ্রেণীই বিপ্লবের সম্পূর্ণ বিজয় সম্বন্ধে আগ্রহশীল থাকবে এবং বিপ্লবকে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বহারা শ্রেণীর স্বাভাবিক মিত্র হবে কৃষক সম্প্রদায়।

বলশেভিকদের বক্তব্যের সমর্থনে লেনিন ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে প্রকাশ করেন তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution।

নব্য-ইসক্রাপন্থীদের সঙ্গে বিতর্কে লেনিন ইতোমধ্যেই দেখিয়েছিলেন যে, যে সব দেশে পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদের বিকাশ হয়েছে, সেখানে পুঁজিবাদীরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ করতে পারবে না, কারণ তাদের মনে ভয় ধরেছে যে সামন্তদের সম্পত্তি জোর করে বুর্জোয়ারা দখল করলে, সর্বহারা শ্রেণীও কালক্রমে বুর্জোয়াদের সম্পত্তি দখল করবে। তাই বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আপোস করে। এই অবস্থায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, বিশেষত কৃষকদের মুক্তির প্রশ্নে নেতৃত্ব দিতে হবে প্রলেতারিয়েতদেরকেই।

১৯০৫ সালে রাশিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের সঙ্গে কৃষকদের মৈত্রী প্রসঙ্গে বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের যে নীতিগত বিরোধিতা তৈরি হয়েছিল তাতে শ্রমিকদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার প্রয়োজনে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রর প্রয়োজনীয়তা বিশদে ব্যাখ্যা করেন লেনিন তাঁর 'Two Tactics of Social Democracy in Democratic Revolution' গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি বলেন যে একটি অবিচ্ছিন্ন বৈপ্লবিক প্রয়াসের মাধ্যমে শ্রমিকরা বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হবে। এই পথে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর গঠনগত শ্রেণী শক্তিগুলির সমন্বয়ের পরিবর্তন হবে। তিনি লিখলেন—"The proletariat must carry the democratic revolution to completion, allying to itself the mass of the peasantry in order to crush the autocracy's resistance by force and paralyse the bourgeoisie's instability. The proletariat must accomplish the socialist revolution, allying to itself the mass of the semi-proletarian elements of the population, so as to crush the bourgeoisie's resistance by force and paralyse the instability of the peasantry and the petty bourgeoisie."

শ্রমিকদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকদের মৈত্রীর মাধ্যমে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী গঠনকারী শ্রেণী শক্তিগুলির সমন্বয়ের পরিবর্তন করে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার তত্ত্ব সামগ্রিকভাবে মার্কসীয় তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করল। প্রথমত কৃষকদের সম্বন্ধে অবস্থানের পরিবর্তন হল, কৃষকদেরকে বৈপ্লবিক শক্তির

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

নভেম্বর বিপ্লব

অন্তর্গত করা হল, যে বৈপ্লবিক শক্তি শ্রমিকদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করবে। দ্বিতীয়ত কৃষকদের সম্বন্ধে অবস্থান পরিবর্তন করার ফলে, তাদের বৈপ্লবিক শক্তির অন্তর্গত করার ফলে মার্কসবাদের প্রয়োগের ক্ষেত্রও বিপুলভাবে বিস্তৃত হল। এতদিন পর্যন্ত ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর উপস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগের কথা ভাবা হত। কিন্তু কৃষকদেরকেও বৈপ্লবিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত করার ফলে ইউরোপের বাইরের দেশগুলিতে যেখানে পুঁজিবাদের বিকাশ সামান্যই ঘটেছে, সেখানেও বৈপ্লবিকতত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদের প্রয়োগের বাস্তবতা সৃষ্টি হল। তৃতীয়ত ঐতিহাসিক অনিবার্যতাবশত বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন শক্তিগুলি একটির পর একটি সম্পূর্ণভাবে বিকাশলাভ করবে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের পর পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদের পরেই সমাজতন্ত্র—এই তত্ত্বটাকেই বাতিল করে দেওয়া হল। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে যেমন সরাসরি সমাজতন্ত্রের দিকে যাত্রা করা যাবে, তেমনি অনুন্নত দেশগুলি থেকেও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে, বিভিন্ন দশার মধ্য দিয়ে এক দীর্ঘতর প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ যে কোনো বৈপ্লবিক ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র।

পশ্চিম ইউরোপে যেসব সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ধরে নিয়েছিল যে বুর্জোয়া বিপ্লবের পর একটি সুদীর্ঘ অবসর এসে পড়বে, পঞ্চাশ কি একশো বছরের জন্য আন্দোলনের 'ভাঁটা' পড়ে যাবে এবং তখন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সর্বহারাদের উপর শোষণ চলবে এবং বুর্জোয়ারা নিজেদের সম্পদ বাড়িয়ে চলবে—তাদের এইসব মতামত লেনিন 'দুই কৌশল' গ্রন্থে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিলেন।

"কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মনোভাব" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লেনিন লিখলেন—"গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা অবিলম্বে এবং ঠিক আমাদের শক্তি, অর্থাৎ শ্রেণী সচেতন এবং সুসংহত সর্বহারার শক্তি অনুপাতে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করবো। আমরা নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের পক্ষপাতী। আমরা মাঝপথে থেমে যাব না।"

একা একটি মাত্র দেশে এমনকি সে দেশটি পশ্চাৎপদ হলেও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত তখনও লেনিনের নীতির মধ্যে ছিল না। কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতিগুলির প্রায় সবই তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দশ বছর পরে ১৯১৬ সালে লেনিন ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছোন।

১৯১৬ সালে লেনিন প্রকাশ করলেন তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক গ্রন্থ—'Imperialism, the Highest Stage of Capitalism'। এই গ্রন্থে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণটির বৈশিষ্ট্যগুলি নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলেন লেনিন—(১) পুঁজি এবং উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন একটি উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে একচেটিয়া পুঁজির সৃষ্টি করেছে যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। (২) ব্যাঙ্ক পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে লগ্নীপুঁজির (Finance Capital) সৃষ্টি হয়েছে, (৩) পণ্য রপ্তানির তুলনায় পুঁজির রপ্তানি বিপুলভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে, (৪) আন্তর্জাতিক একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংগঠনগুলি বিশ্বকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে, (৫) বৃহত্তম পুঁজিবাদী শক্তিগুলির মধ্যে সমগ্র বিশ্বকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

অর্থাৎ পুঁজিবাদ যখন একচেটিয়া লগ্নীপুঁজির স্তরে পৌঁছচ্ছে, তখন তাকে লেনিন সাম্রাজ্যবাদ বলছেন। একচেটিয়া লগ্নীপুঁজির সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের সংযোগের ফলে রাষ্ট্রের উপরও একচেটিয়া লগ্নীপুঁজির আধিপত্য কায়েম হয়েছে এবং তার ফলে রাষ্ট্রের চরিত্রও পরিবর্তীত হচ্ছে—এটি এই পর্বের পুঁজিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পর্বে বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের অধিনস্থ একচেটিয়া পুঁজি সারা বিশ্বের বাজার দখলের জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের অন্তর্গত পুঁজিবাদী শক্তিগুলির অসম বিকাশের ফলেই ইতোমধ্যেই ভাগ করে নেওয়া বিশ্ববাজারকে পুনরায় ভাগ করবার জন্য জাতি-রাষ্ট্রগুলি ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে।

লেনিন এই গ্রন্থে ঘোষণা করছেন সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই ঐতিহাসিকভাবে অচল হয়ে পড়ছে এবং এটা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ বা moribund capitalism। একটি উৎপাদন ব্যবস্থা কখন ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে পড়বে তা নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। একটি প্রচলিত মত ছিল যে, যখন কোনো উৎপাদন ব্যবস্থা অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর হয়ে পড়বে, দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়তে থাকবে, তখনই সেই ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে পড়ছে বলে সিদ্ধান্ত জানা যাবে। কিন্তু লেনিন এই প্রচলিত মতের বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন যে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে বাতিল হয়ে পড়ছে, কারণ তা সমগ্র মানব সমাজকে একটি পর্যায়ক্রমিক এবং বিপর্যয়কর যুদ্ধের মধ্যে নিমজ্জিত করছে। উপনিবেশগুলিও এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে। সাম্রাজ্যবাদী শ্রমজীবী মানুষের কাছে দুটি বিকল্পের মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করছে— নিজেকে এবং তার সহযোগী শ্রমিককে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করা অথবা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকেই সমূলে উৎপাটন করা। যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ বিপ্লব এবং সামাজিক ধ্বংসের মধ্যে একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জায়গায় মানব সমাজকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাই বলা হচ্ছে—Imperialism is the limit of capitalism।

এই গ্রন্থে লেনিন দেখালেন, বিপ্লবের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদের যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বকে পুঁজিবাদী শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলেছে। Entire world in a single imperialist chain—সারা বিশ্ব একটিমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পর যেহেতু পশ্চাৎপদ দেশ, ঔপনিবেশিক দেশ, আধা সামন্ততান্ত্রিক— আধা পুঁজিবাদী দেশ এবং পুঁজিবাদী দেশ— সব দেশগুলিই যেহেতু একই শৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে পড়েছে, এই অবস্থায় যদি দুর্বলতম গ্রন্থিটা—Weakest link in the chain সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় এবং সঠিক সময়ে আঘাত করা যায়, তবে পশ্চাৎপদ পুঁজিবাদী দেশেও প্রথম সর্বহারা বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্বহারা বিপ্লবের এই নতুন সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করলেন। শুধু উল্লেখই করলেন না, এই তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করলেন। সে সময়ে রাশিয়া ছিল পুঁজিবাদের বিচারে পশ্চাৎপদ দেশ—backyard of European capitalism। সেই সময় চলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, গোটা বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কট। এই সময় রাশিয়ায় সঙ্কটটা তীব্রতম রূপ পেয়েছিল। সেই সময় রাশিয়াই ছিল দুর্বলতম গ্রন্থি। সঠিক সময়ে সঠিক গ্রন্থিতে আঘাত করতে পেরেছিলেন বলেই কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চাৎপদ রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব সফল করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের সময়ে যে বৈপ্লবিক সন্ধিক্ষণ তৈরি হয়েছিল—যাকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে লেনিন নভেম্বর বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন, তার থেকে বর্তমান পরিস্থিতি বেশ কিছুটা আলাদা হয়ে গেছে। জাতি-রাষ্ট্রের অধীনে লগ্নীপুঁজির পরিবর্তে বর্তমান আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি জাতিরাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যেহেতু লগ্নীপুঁজি আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে, তাই পুঁজির বন্ধনহীন চলাচলের জন্য জাতি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে আছে। বর্তমান নব্য-উদার অর্থনীতিকে অতিক্রম করার জন্য সারা বিশ্বজুড়েই বিপ্লবী প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। ভারতবর্ষের মতো দেশের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী যে সংহত রূপ লাভ করেছে, তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বীজ নিহিত রয়েছে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

বি জে প্রেস তুলে দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

প্রশাসনের প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী? যার নির্বাচনী কেন্দ্রের মধ্যেই এই ঐতিহ্যশালী সরকারী প্রেসের অবস্থান। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি রাজ্যের ঐতিহ্যশালী হেরিটেজ মর্যাদায় ভূষিত 'বি জি প্রেস'কে রক্ষার স্বার্থে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের লড়াই সংগ্রামে সর্বদা কর্মচারী সমাজকে নিয়ে পাশে থাকবে এবং এই প্রেসকে রক্ষার স্বার্থে আগামীদিনে আরও বৃহৎ আন্দোলনে শামিল হবে। বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ বি জি প্রেসে অনুষ্ঠিত এক বিশাল প্রতিবাদ সভায় এই বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। এদিনের প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বাবলু ঘোষ।

সভাপতি কর্তৃক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রাক্তন নেতৃত্ব সন্দীপ বিশ্বাসকে মঞ্চে আহ্বানের পরবর্তীতে শহীদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্যে বাবলু ঘোষ বলেন গোটা রাজ্যের ঐতিহ্য শতাব্দীপ্রাচীন বি জি প্রেসের জমিকে উন্নয়নের অছিলায় প্রমোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছে বর্তমান সরকার। বিভিন্ন দপ্তরে যখন আধুনিকীকরণ হচ্ছে তখন এই প্রেসের ২৩ বিঘা জমি ও বিশাল প্রাসাদোপম বিল্ডিং-ই কাল হল। এখান থেকে পাঁচ লক্ষাধিক ক্যালেন্ডার ছাপা হয়। আগে দিবারাত্রি কাজ হত, ১৪টি ভাষায় ছাপার কাজ হত। ১৯৯০ সালে এমনকি তামিলনাড়ু রাজ্যের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও এখানে ছাপা হয়েছিল। এক সময় চুক্তির কর্মচারী সহ প্রায় ১৫০০ কর্মচারী ছিল যা এখন কমতে কমতে ২১৫ জন-এ এসে দাঁড়িয়েছে। একটি এত বড় প্রেস এখানে থাকার মধ্য দিয়ে আশেপাশের মানুষেরও কর্মসংস্থান হত। বিজি প্রেসকে বর্তমান স্থানে রাখার জন্য নিয়ামককে চিঠি দেওয়া হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। প্রেস এখানেই রাখতে হবে এটিই সংগঠনের দাবি। প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী ভবনে ভাড়ার বিনিময়ে থাকা অফিসগুলি এখানে তুলে আনা হোক---এ প্রস্তাবও আমরা দিয়েছি। আর অব্যবহৃত জমি সরকারী কাজে ব্যবহার করা হোক, কিন্তু কোনোভাবেই তা লুঠেরাদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। এখানে শুধুমাত্র ছাপাখানাই নয়, স্টেশনারী দপ্তরও আছে যা দিন দিন ছোটো করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারী এই তুঘলকী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন এটা কর্মচারী সমাজের কাছে কখনোই কাম্য ছিল না, যে সরকারী প্রেস তুলে দেওয়ার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত করতে হবে। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত আপনারা এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। সমিতি চিঠি দিয়েছে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও রাজ্য সরকারের শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী ও ঐ দপ্তরের সচিবকে পত্র প্রেরণ করেছে। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রধান মুখ্যমন্ত্রীকেও প্রতিবাদ পত্র দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি রাজ্যেই সরকারী প্রেস রয়েছে, সরকারী প্রেসে যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় তা বেসরকারী প্রেসে হয় না। সরকারী প্রেসে ছাপানোর খরচ কম আর সরকারী প্রেসে কাজ হলে ভাবমূর্তি বাড়বে না কমবে? সরকারকে ভাবতে বলব যখন বিভিন্ন দপ্তরে আধুনিকীকরণ হচ্ছে, তখন ঐতিহ্যশালী বি জি প্রেসে কেন আধুনিকীকরণ হবে না? ৬ দফা দাবিতে আমরা শিল্পমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সেন বিগত ৪ জানুয়ারি ২০২২ রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিবকে কার্যত কড়া চিঠি দিয়ে আলিপুর এলাকার সরকারী বি জি প্রেসকে এখনই উঠে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। সেই চিঠিতেই হিডকোর এম ডি লিখেছেন "আলিপুর প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের দ্রুত উন্নতি চাইছেন। তাই হিডকোর হাতে চলে আসা সরকারী বি জি প্রেসের আধিকারিক ও কর্মীদের এখনই বি জি প্রেসের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে।"

কিন্তু আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে বলতে চাই এভাবে সরকারী প্রেসের জমি, সরকারী জমি প্রমোটার, জমি হাঙরদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। আমরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা এর আগে প্রত্যক্ষ করেছি দক্ষিণেশ্বরে Transport Dept.-এর জমিতে ফ্ল্যাট হচ্ছে। মানুষ বলছেন দুর্নীতি হচ্ছে। এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হবে না—তা বলা যাবে না। প্রেসের কর্মচারীদের বলছি আপনারা জমি ছাড়বেন না। নাগরিক হিসাবে, সরকারী কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। পুলিশ লাঠিপেটা করতে পারে, কিন্তু জায়গা ছাড়া যাবে না। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জন্মলগ্ন থেকেই সংগঠন তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির রয়েছে, যেখানে তার একমাত্র কাজ কর্মচারীকে রক্ষা করা, দেশ ও রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা। কর্মচারী সমাজের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কর্মী-নেতৃত্ব বদলী হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, মুর্শিদাবাদে। ডি.এ-র দাবিতে নবান্নে শ্লোগান দিলে গ্রেপ্তার হয়ে লকআপে যান নেতৃত্বরা, কিন্তু সংগঠনের লড়াই থেমে থাকবে না। আজকের এই প্রতিবাদ সভায় আরও বেশি সংখ্যক কর্মচারী জমায়েত হতে পারত, মাঠ উপচে রাস্তায় আছড়ে পড়ত, কিন্তু কোভিড বিধির কারণে আমরা শুধু কর্মী নেতৃত্বরাই আজ প্রেসের কর্মচারী সদস্য বন্ধুদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আগামী দিনে সরকার যদি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে তাহলে লড়াই আরও জোরদার হবে। রাজ্যের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে এই ঐতিহ্যবাহী প্রেসকে রক্ষা করা শুধুমাত্র প্রেসের কর্মচারীদের নয়, পশ্চিমবঙ্গের আপামর কর্মচারী সমাজের দায়িত্ব, তাই বিরোধী সংগঠনের উদ্দেশ্যেও আহ্বান রাখছি সরকারী সম্পদ রক্ষার্থে একজোটে লড়াইতে শামিল হোন, কাউকে দুর্নীতি করার সুযোগ দেবেন না। আশেপাশের মানুষের মধ্যেও গুঞ্জন উঠছে, আগামীতে সরকারী প্রেস রক্ষার্থে আরও বৃহত্তর লড়াই আন্দোলনে শামিল হতে হবে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন দেশ ও রাজ্যের সম্পদ রক্ষার্থে গোটা দেশজুড়ে লড়াই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের কৃষকরা দীর্ঘ এক বছরের বেশি সময় ধরে লড়াই করে সরকারকে বাধ্য করছেন তিন কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে। ৫৬ ইঞ্জির গর্বের ছাতি নেমে এসেছে হয়তো ২৬ ইঞ্চিতে। পশ্চিমবঙ্গে দেউচা পাঁচামীর মানুষেরা লড়াই করছেন তাদের নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে, নিজ অধিকার রক্ষার্থে। আগামী ২৮-২৯ মার্চ দেশের শ্রমিক সমাজ সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে দেশের সম্পদ রক্ষার্থে, দেশের কৃষক সমাজ তাকে সমর্থন করেছে। দেশজোড়া কৃষক শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে। আমাদেরও এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আগামীর লড়াইতে শামিল হতে হবে।

প্রতিবাদ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে বাবলু ঘোষ বলেন, প্রেস বাঁচানোর স্বার্থে এই লড়াই জারি থাকবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বের পরামর্শ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে। উপস্থিত কলকাতার ৭টি অঞ্চল, পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ও বিভিন্ন সমিতির নেতৃত্ব সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি রাজ্যের মানুষের স্বার্থে, সরকারী ঐতিহ্যবাহী প্রেস বাঁচানোর ভবিষ্যতের লড়াইতে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। □

দেবাশীষ রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

মহার্ঘভাতার ফারাক বেড়েই চলেছে

ভাতা বাড়িয়েছে রাজ্য।

কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন সরকারী কর্মচারীরা?

২০১৭ সালের শেষে এ রাজ্যে সর্বশেষ গ্রুপ ডি পদে ৫ হাজার কর্মী নিয়োগ করেছিল নবান্ন। সেই হিসাবে রাজ্যে নবীনতম গ্রুপ ডি হিসাবে ২০১৮ সালের শুরুতে কাজে যোগ দেওয়া কর্মীদের ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই নবীনতম গ্রুপ ডি একজন কর্মচারী ফি মাসে ৩ হাজার টাকা বেতন হারাচ্ছেন। বছরে ৩৬ হাজার টাকা। চাকরির চার বছরের মেয়াদ হিসাব করলে প্রায় ২ লক্ষ টাকা প্রাপ্য বেতন লুট করে নিয়েছে সরকার। আর গত ১০-১৫ বছর ধরে গ্রুপ ডি পদের কর্মীদের হিসাব করলে বঞ্চনার পরিমাণ আরও বহুগুণ।

গ্রুপ সি পদে নিয়োগের জন্য একসময় রাজ্য সরকার স্টাফ সিলেকশান কমিটি (এসএসসি) গড়ে ছিল। পরবর্তীকালে এসএসসি-কে তুলেও দেওয়া হয়েছে। এসএসসি'র মাধ্যমে ২০১৬ সালে বেশ কিছু গ্রুপ সি পদে সরকারী কর্মচারী নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তাদেরকেই এই মুহূর্তে রাজ্যের নবীনতম গ্রুপ সি কর্মী ধরলে ফি মাসে তারা ৪ হাজার ৫৮ টাকা ডিএ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বছরে ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা হারাচ্ছেন গ্রুপ সি পদে কাজে যোগ দেওয়া নবীনতম কর্মীরা। বছরে একজন কর্মীর কাছ থেকে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকার বেশি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকারের পুরানো গ্রুপ সি কর্মীদের সংখ্যা ধরলে পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনা। আধিকারিকদের মধ্যে সরকারের 'গ্রুপ এ' ও 'গ্রুপ বি' অফিসারদের মধ্যে ডি এ না পাওয়ার হিসাব আরও ভয়াবহ।

বহু টালবাহানার পর অভিরূপ সরকারকে চেয়ারম্যান করে গঠিত ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ নবান্ন গ্রহণ করে ২০১৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। এরপর নয়া বেতন কাঠামোর জন্য রোপা জারি করে রাজ্য সরকার। বেতন কমিশনের সুপারিশ থেকে রোপা বিধি, কোথাও একবারের জন্য লিখিতভাবে উল্লেখ নেই ডিএ'র প্রসঙ্গ।

এ রাজ্যে ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রথম বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে ৪টি বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়। গত চার দশকে এই প্রথমবার বেতন কমিশনের রোপা বিধি থেকেই লোপাট করে দেওয়া হল ডিএ কথাটিকে। কেন্দ্রীয় সরকারের সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ার পর তার দিক নির্দেশ থেকে দেশের ২৩টি রাজ্যে তৈরি করা হয়েছিল রাজ্যওয়াড়ি বেতন কমিশন। ২২টি রাজ্যে কর্মচারীদের জন্য বেতন কমিশনের সুপারিশে স্থান পেয়েছে মহার্ঘভাতার ন্যায্য অধিকার। এখানেও নজিরবিহীনভাবে বঞ্চিত থেকে গেছেন শুধু পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীরা।

রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে এর আগে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, মহার্ঘভাতা কর্মচারীদের ন্যায্য আইনগত অধিকার। রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশন ও রোপা বিধিতে এই ন্যায্য আইনগত অধিকারের কোনো উল্লেখ না থাকার ফলে এখন টের পাচ্ছেন রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা। ডিএ এখন তাই স্রেফ মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছার ওপর দাঁড়িয়ে। নবান্নের মর্জির ওপর কর্মচারীদের ডিএ'র ন্যায্য, আইনসঙ্গত অধিকার ঝুলে আছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার যখন বছরে দু'বার কর্মীদের মহার্ঘভাতা দেয়, দেশের অধিকাংশ রাজ্য সরকার সেই পথ অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দিলেও বঞ্চনার পাহাড় জমে এ রাজ্যের কর্মীদের। □

সম্মেলন সংবাদ

সম্মেলন সংবাদ

সম্মেলন সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতির ৬২-৬৩তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ২৫-২৬ ডিসেম্বর, ২০২১ কমরেড পরমেশ চন্দ্র দে মঞ্চ (বাঁকুড়া ধর্মশালা) এবং কমরেড অজিত মুখার্জী নগরে (বাঁকুড়া)। সম্মেলনের প্রাক্কালে ২৪ ডিসেম্বর বিকেলে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। পরবর্তীতে তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে প্রগতিশীল পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৯টায় সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সুসজ্জিত মিছিল ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে বাঁকুড়া শহরের প্রধান এলাকাগুলি পরিক্রমা করে। মিছিল শেষে রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের পরই সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সেটেলমেন্ট কর্মচারীদের প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিভিন্ন লড়াইতে অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরে বলেন, স্বাধীনতার পরেও নানা সময়ে রক্তাক্ত হয়েও সেটেলমেন্ট দপ্তরের কর্মীরা ময়দান ছাড়েনি। আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জয় ছিনিয়ে এনেছেন। সংগ্রাম-আন্দোলনের পাশাপাশি সমিতির সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও প্রশংসা করেন। সম্মেলন উদ্বোধন পর্বে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক চণ্ডীদাস মুখার্জী, বাঁকুড়া জেলা, ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন দেবজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক শেখর সমাদ্দার, আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ কর্মকার, খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সোমরাজ চক্রবর্তী এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক তাপস চক্রবর্তী। আগামী ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য চন্দন মিত্র। ধর্মঘটের প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবেই সম্মেলনে বিপুল সমর্থনের মধ্যে দিয়ে গৃহীত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসেব ও প্রস্তাবাবলীর উপর সবক'টি জেলা থেকে ৪জন মহিলা সহ মোট ৩৪ জন আলোচনা করেন। সম্মেলন মঞ্চে (২৫.১২.২১) প্রথম দিনের অধিবেশনে শেষের দিকে সমিতির মুখপত্র 'ভূমিজ' বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করেন উপস্থিত পাঁচজন প্রবীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। এরপর ভূমিজ সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস বিশেষ সংখ্যা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক আশীষ দুবে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অসংগঠিতদের সংগঠিত করার আহ্বান অনুযায়ী আমাদের বিভাগে কর্মবন্ধু ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের সদস্য করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সমিতির গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর প্রস্তাব পেশ করেন যুগ্ম সম্পাদক শেখর সম্মাদার। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ও বাঁকুড়া জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক অতনু মজুমদার। ক্রেডেনশিয়াল রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক স্নেহাশীষ পাল, আয়-ব্যয়ের উপর জবাবী ভাষণ দেন কোষাধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ কর্মকার। প্রতিবেদনের উপর উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক কিংশুক বিশ্বাস। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে ২০ জন মহিলা সহ ২৬৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ৯৪ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ১৭ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সভাপতি কিংশুক বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক শেখর সমাদ্দার, কোষাধ্যক্ষ অরুণ ভট্টাচার্য এবং 'ভূমিজ' পত্রিকা সম্পাদক বিদ্যুৎ দাস ও সহযোগী সম্পাদক আশীষ নস্কর সম্মেলন থেকে নির্বাচিত হন। প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ৪২,০০০ টাকার বই প্রতিনিধিবৃন্দরা ক্রয় করেছেন। রাজ্য সম্মেলন পরিচালনা করেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনা সাহা, দিবাকর ধরকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শেষ হয়। □

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল

ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর ২৩তম রাজ্য সম্মেলন কোচবিহার জেলার কর্মচারী ভবনে গত ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত হল। রাজ্য সম্মেলনের একদিন পূর্বে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ১৭ ডিসেম্বর সমিতির প্রয়াত প্রাক্তন নেতা কমরেড বংশীধর যশের নামে প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন কোচবিহার জেলার ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আশীষ গোস্বামী। ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ সম্মেলন শুরুর আগে কোচবিহার শহরে আগত প্রতিনিধিদের এক বর্ণাঢ্য মিছিল হয়। এরপর সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয়। ২৩তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে কমরেড শ্যামচাঁদ মনিগ্রাম নগর ও কমরেড সরোজ বিকাশ রায় মঞ্চ নামকরণ করা হয়। সম্মেলন পরিচালনা করেন বিরাজ ভৌমিক ও শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সংগ্রামী হাতিয়ারের সহযোগী সম্পাদক মানস কুমার বড়ুয়া। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ১২০জন প্রতিনিধি। প্রতিবেদন পেশ করেন সোমনাথ পোদ্দার। সম্মেলনে আয়-ব্যয় পেশ এবং বিভিন্ন খসড়া প্রস্তাব পেশ করা হয়। ২১জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ নেন। পরবর্তীতে সম্পাদকের জবাবী ভাষণের পর শুরু হয় নতুন কমিটি গঠনের কাজ।

২৩তম রাজ্য সম্মেলন থেকে **সভাপতি**—প্রবীর ঘোষ, **সাধারণ সম্পাদক**—সোমনাথ পোদ্দার, **সংগঠন সম্পাদক**—অরুণ দাস, **কোষাধ্যক্ষ**—জয়ন্ত আঢ্য, **দপ্তর সম্পাদক**—মানিক শঙ্কর মৈত্র, **মুখপত্র সম্পাদক**—সন্দীপ বিশ্বাস সহ ৫৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন করা হয়। ৫৮ জনের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন ১৪ জন। রাজ্য সম্মেলনে তিনদিনব্যাপী গণসঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। □

পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেকটরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন

গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পশ্চিমবঙ্গ ডাইরেকটরেট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের ৪৫তম রাজ্য সম্মেলন কোভিড বিধি মেনে কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় সভাপক্ষে (কর্মচারী ভবন) ও কমরেড মলয় রায় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির সভাপতি শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। শাশ্বতবন্ধু মুখার্জী, অরুণ দত্ত, প্রতাপ বিদ্যান্ত ও রঞ্জন সমাদ্দারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলন পরিচালনা করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সম্মেলন উদ্বোধন করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রবীণ নেতৃত্ব প্রবীর মুখার্জী বুকস্টল উদ্বোধন করেন। সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অসিত ভট্টাচার্য্য সমিতির মুখপত্র 'শরিক'-এর সম্মেলন বিশেষ সংখ্যা আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এঁদের প্রত্যেকেই বিরাজমান পরিস্থিতিতে দুর্ভেদ্য সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সম্মেলনের খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক শিলাদিত্য মোহরার। ১৮ জন প্রতিনিধি খসড়া প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য্য, সংযুক্ত কৃষক মোর্চা আহূত সারা ভারত ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানান। সম্মেলন মঞ্চে পি আর সি ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়। জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিখিল রঞ্জন পাত্র। সম্মেলন থেকে শাশ্বতবন্ধু মুখার্জীকে সভাপতি, শিলাদিত্য মোহরারকে সাধারণ সম্পাদক, দেবশঙ্কর সিন্‌হা ও ভাস্কর ভট্টাচার্য্যকে যুগ্ম সম্পাদক, প্রশান্ত ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ, শান্তনু সরকারকে সমিতির মুখপত্র 'শরিক'-এর চেয়ারম্যান সহ মোট ২৮ জনকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। সম্মেলনে মোট ১৬৪ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বুকস্টলে মোট ১৮,৫০০ টাকা মূল্যের বই বিক্রয় হয়। □

পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতি

গত ৩১ ডিসেম্বর '২১-১ জানুয়ারি '২২, দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হল, পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির ৪৮তম রাজ্য সম্মেলন। ৩১ ডিসেম্বর বর্ণাঢ্য মিছিল, রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা পালন করে শুরু হয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন। মহতী রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বাণী প্রসাদ ব্যানার্জী। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে, দেশের শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসেবে দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষায় এবং নিজেদের অর্জিত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের পথে অবিচল থাকার আহ্বান জানান। এই উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী ও শিলিগুড়ি শহরের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তিনি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে অনুগামী অংশর কাছে আরও দৃঢ়তার সাথে সংগঠনের বক্তব্যকে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অধিবেশনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক তাপস কুমার সরকার, জেলা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক পার্থ ভৌমিক। উদ্বোধনী অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ সমিতির সদস্য / সদস্যাদের পুত্র / কন্যাদের সংবর্ধনা। এছাড়াও সদ্য অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর দু'জন সদস্যকেও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য। আয়-ব্যয়ের হিসাবে পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ অসীম লাহিড়ী। খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক মণ্টু দাস। এর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠন সম্পাদক রাধাগোবিন্দ শীল। মহিলা কর্মচারীদের প্রসঙ্গে একটি পৃথক প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা লক্ষী দাস এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা গৌরী রায়। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উত্তম চক্রবর্তী। সংগঠনের নিয়মাবলী সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চুনীলাল মুখার্জি।

আগামী ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ অনুষ্ঠিতব্য সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক জয়দেব হাজরা। রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন, বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা সরকারী গ্রুপ-ডি কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খোকন পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকারের নির্মম অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি সম্মেলন মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ গ্রুপ-ডি সরকারী কর্মচারী সমিতির মুখপত্র সমিতির বার্তার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

রাজ্য সম্মেলনে ১৭ জন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের প্রতিনিধি সহ মোট ২৮৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, খসড়া প্রস্তাবাবলী ও আয়-ব্যয়ের হিসেবের ওপর আলোচনায় অংশ নেন ৫ জন মহিলা সহ মোট ৩২ জন প্রতিনিধি। তাঁদের আলোচনার ভিত্তিতে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জয়দেব হাজরা। রাজ্য সম্মেলন থেকে ১৩১ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও ৬৪ জনের ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হয়। সম্মেলন মঞ্চেই অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা থেকে ১৮ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন দার্জিলিং জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতৃত্ব উত্তম চতুর্বেদী। সম্মেলনের দু'দিনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা মোট ৩০ হাজার টাকার পুস্তক ক্রয় করেন।

মিনা রায়, গৌতম দেওঘরিয়া ও প্রদীপ রাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন। সম্মেলন থেকে নির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন---

সভাপতি—প্রশান্ত সাহা; **সাধারণ সম্পাদক**—জয়দেব হাজরা; **যুগ্ম সম্পাদক**—গোরচাঁদ সর্দার, রাধাগোবিন্দ শীল; **দপ্তর সম্পাদক**—দিলীপ কোলে; **কোষাধ্যক্ষ—অসীম লাহিড়ী।**

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
49th Year, 7th & 8th Edition, November-December 2021

Regd. No. : 18484/71

সংবিধানকে রক্ষা করো

সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করো

আশীষ ভট্টাচার্য
(সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বর্ষ উদ্‌যাপনের বর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী সুভাষ চন্দ্র বোষের ১২৫তম জন্মবর্ষিকীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিন থেকে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের উদ্‌াপন শুরুর ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের সরকার। অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের ভাবনা, রাজ্যের ট্যাবলো নির্বাচন সহ নানা প্রশ্নে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিতর্কেরও সৃষ্টি করেছে, যা দেশের স্বাধীনতা সংগামের আবেগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার এই সময়েই ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির আহ্বানে আগামী ২৮-২৯ মার্চ '২২ দুই দিনের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রস্তুতি হচ্ছে। এবারের ধর্মঘট তিন দশকে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে ২১তম দেশব্যাপী ধর্মঘট। ১২ দফা সর্বভারতীয় দাবি ও ১ দফা আমাদের নিজস্ব দাবিতে ধর্মঘটে শামিল হব আমরা। ১৩ দফা দাবির বৈশিষ্ট্য হল যে, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সহ পরোক্ষভাবে ছাত্র-যুব মহিলা ও অন্যান্য অংশের মানুষের 'সব হারা না পাওয়া'র যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে দাবিসমূহতে। স্বাভাবিক কারণেই দাবি আদায়ের মূল শর্ত সমাজের ব্যাপকতম শোষিত বঞ্চিত মানুষের ঐক্য। সাম্প্রতিক সময়ের কৃষক আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিজয় সেই ঐক্যের দৃষ্টান্ত হাজির করেছে। কিন্তু মানুষের ঐক্যকে প্রতি মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনায় ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রও চলছে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-জাতের ভিত্তিতে বিভাজনের চক্রান্তে লিপ্ত রাষ্ট্রের শাসক। দর্শন ওদের উত্তর-আধুনিকতাবাদ, যা শ্রেণীর অস্তিত্বকেই নস্যাৎ করে। তাই সামগ্রিকতার বিপরীতে পরিচিতির সত্বাকে রাজনীতির ট্রাম্প কার্ড করে মানুষের মধ্যে বিভাজনকে তীব্র করতে চায় বর্তমানে দেশের মসনদে বসে থাকা শাসক দল।

১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি থেকে কার্যকর ভারতের সংবিধানের মূল প্রস্তাবনা হল—'সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ভারত'। যদিও ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র শব্দ দুইটি ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর পরবর্তীতে সংবিধানে যুক্ত হয়। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার প্রতিটি কথা সহ দেশের বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, We the people of India-র ভারত ভাবনা আজ প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত হচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় এমন এক শক্তি অধিষ্ঠিত যাদের চালিকা শক্তি ফ্যাসিস্ট মতাদর্শে জারিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (RSS)। ১৯২৫ সালে নাগপুরে বিজয়া দশমীর দিনে 'হিন্দুত্ববাদী ভারত' গঠনের লক্ষ্যে আর এস এস-এর জন্ম। ফ্যাসিবাদের দুই জনক হিটলার ও মুসোলিনীর আদর্শে দীক্ষিত। ওদের গুরু সাভারকারই আমাদের দেশে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রবক্তা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর এস এস-এর কোনো স্থান নেই। সাভারকার মুচলেকা দিয়ে আন্দামান জেল থেকে ও অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মুচলেকা দিয়ে পুলিশের হাত থেকে রেহাই পান। ওদের চোখে এরাই 'বীর'। আর এস এস-এর আর এক 'গুরু' গোলওয়ালকার তার 'Bunch of thoughts'-এ দেশের অভ্যন্তরীণ প্রধান তিন শত্রু হিসাবে মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্টদের চিহ্নিত করেছেন এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শক্তি ক্ষয় না করার পরামর্শ দিয়েছেন হিন্দুদের। সংঘ পরিবারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ব্রিটিশদের সহযোগিতা ও লেজুর বৃত্তির ইতিহাস। ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি সত্ত্বেও আর এস এস-এর হিন্দু ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ার হতাশা থেকেই সংঘের বৌদ্ধিক সেবক নাথুরাম গডসে ১৯৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদী নেতা 'জাতির জনক' আপাদমস্তক ধার্মিক অথচ ধর্মরনিপেক্ষ মহাত্মা গান্ধীকে প্রকাশ দিবালোকে হত্যা করে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর মূলে সংঘ পরিবারের এটিই প্রথম বড়ো আঘাত।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের শাসক শ্রেণী তাদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থে অবশিষ্ট সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ না করে, সেই কাঠামোর উপরই পুঁজিবাদ চাপিয়ে দেওয়ায়, সামন্ততন্ত্রের পশ্চাপদতা অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামী, বর্ণভেদ, জাত-পাত, অন্ধ কু-সংস্কার ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধিগুলি সমাজে থেকে যায়। আবার ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক না করে সব ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের সমমনোভাবের নীতি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নেও বিভ্রান্তি তৈরি করে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরেও রাজনৈতিক সমতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা পূরণের ঘাটতি থেকে যাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বামপন্থীদের বাদ দিয়ে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে দুর্বল অবস্থান ও নরম মনোভাবের সুযোগ নিয়ে আর এস এস পরিচালিত তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপি ও অন্যান্য শাখা সংগঠনগুলি দেশব্যাপী ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করে। ধর্মনিরপেক্ষ উদার জাতীয়তাবাদের বিপরীতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীজাত উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ বিকশিত হয়, তাকে আশ্রয় করে ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর উপর সংঘ পরিবারের দ্বিতীয় আঘাত।

সমসাময়িক সময়েই সোভিয়েত সহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের ফলে বিশ্ব রাজনীতির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে হেলে পড়ার মধ্য দিয়েই নয়া উদারবাদী নীতির উন্মেষ, যার তিনটি অঙ্গ--- উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন, বিপরীতে সামরিক আগ্রাসন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে নয়া উদারবাদী নীতির দীর্ঘস্থায়ী কাঠামোগত সঙ্কটের ফলে সৃষ্ট গণঅসন্তোষ দেশে দেশে উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তির বাড়-বাড়ন্তে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে, যা বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের মহামন্দার সময়ে বিশ্ব একচেটিয়া পুঁজির সমর্থনে ফ্যাসিবাদের উত্থানকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

> **ভারতের সংবিধান**
>
> **<u>প্রস্তাবনা</u>**
>
> **"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"**

আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ১৯৯৮ সালে বাজপেয়ীজির নেতৃত্বে বিজেপি রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু একদিকে জোট সরকারের বাধ্যবাধকতা ও অপরদিকে সংসদের ভিতরে-বাইরে বামপন্থীদের ব্যাপক আন্দোলনের প্রভাবে তাদের সাম্প্রদায়িক এ্যাজেন্ডাকে পুরোপুরি উন্মোচিত করতে পারেনি। কিন্তু ২০১৪ পরবর্তী সময়ে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকারের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংসদে বামপন্থীদের প্রভাব দুর্বল হওয়ার সুযোগে সংঘ পরিবার তাদের Hidden agenda-কে সামনে এনেছে ও তাকে পুরোপুরি রূপায়িত করতে দেশের সংবিধানের প্রদত্ত অধিকারের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে।

প্রথমত আর এস এস চালিত বিজেপি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে বিকৃত করার প্রয়াস চালাচ্ছে, কারণ ওরা স্বাধীনতা সংগ্রামকেই অস্বীকার করে। ২০২০-এর ৫ আগস্ট অযোধ্যায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করে, ঐ দিনটিকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারিত পাক্ষিক 'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার' পত্রিকায় মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দু শাসকের লড়াইকেও স্বাধীনতা আন্দোলন হিসাবে দেখানো হয়েছে। সংঘ পরিবারের ছদ্ম-ইতিহাসবিদদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের আগেও ভারত দাসত্বের মধ্যে ছিল। যার মধ্য দিয়ে ভারতের মধ্যযুগের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত সংঘপরিবার দীর্ঘ ৭৩ বছরের ভারতীয় সংবিধানকে 'হিন্দু বিরোধী' বলে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্রকে ওরা স্বীকার করে না। এই বিরোধিতার জল মহামান্য আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এক ধর্ম (হিন্দু), এক ভাষা (হিন্দি) ও এক রাষ্ট্র (হিন্দুস্তান) ভাবনায় 'হিন্দুত্ববাদী' রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে সংঘ পরিবার মনুসংহিতার আদলে সংবিধান রচনা করতে চায়, যা আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যকেই প্রতিষ্ঠা করবে।

তৃতীয়তঃ, সংঘ পরিবার রবিঠাকুর রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের ঘোরতর বিরোধী। 'জনগণমণ' সম্পর্কে ওরা কখনোই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। 'সিন্ধু' ও 'অধিনায়ক'---এই শব্দ দুটির বিরোধিতাকে আদালত পর্যন্ত নিয়ে গেছে। আসলে জাতীয় সঙ্গীতের মর্মবস্তু 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' ও বহুত্ববাদকে ওরা মান্যতা দেয় না। এমনকি জাতীয় পতাকারও বিরোধী সংঘ পরিবার। জাতীয় পতাকার তিনটি রং; ওরা 'তিন' সংখ্যাকে মনে করে অমঙ্গলের প্রতীক। ওরা ভাগুয়া (গেরুয়া) রং-এর পক্ষে, ওদের মঙ্গলের প্রতীক স্বস্তিকা চিহ্ন।

দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গৌরবময় স্বাধীনত সংগ্রাম, দেশের সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা সম্পর্কে সংঘ পরিবারের মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই পরিষ্কার যে, ওরা হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে হাতিয়ার করেই আমাদের দেশে সংখ্যাগুরু জাতীয়তাবাদ তথা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই সাভারকারের 'Who is Hindu' গ্রন্থকেই ওরা হিন্দুত্বের ইস্তাহারের স্বীকৃতি দেয়। যার মূল কথা ভারতের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে জন্মভূমি-পিতৃভূমি, পুণ্যভূমি একই হতে হবে, অন্যথায় 'হিন্দুত্ব'কে স্বীকার করতে হবে। ভারতের সকল ধর্মীয় পরিচিতিকে হিন্দু ধর্মের অধীন করতে চায় ওরা। এই লক্ষ্যেই রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে সংবিধানের মূল চারটি স্তম্ভ—আইন সভা, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সংবাদ মাধ্যমে 'কর্তৃত্ববাদ' প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর সংঘ পরিবার। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংঘ পরিবারের অনুগত লোকজনদের বসিয়ে দখলদারি কায়েমে লিপ্ত কেন্দ্রের শাসক দল। সংবিধান প্রদত্ত ৩৭০ ধারা একতরফা ভাবে বাতিল করে, কাশ্মীর রাজ্যের স্বীকৃতি কেড়ে, এখন কাশ্মীরকে জমি হাঙড়দের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করতে চায় সংঘ পরিবার। NRC, CAA, NPR-এর মাধ্যমে নাগরিক জীবনে অস্থিরতা তৈরি করে দেশবাসীর নাগরিকত্বকেও প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছে। মিথকথা, পুরাণের আখ্যানকে বিজ্ঞানের মোড়কে সরকারী সিলমোহর দিয়ে বিজ্ঞান মনস্কতা বিরোধী প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, কল্পবিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানকে উৎসাহিত করে বিজ্ঞান কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করা হচ্ছে। অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 'বদানত্যতায়' বস্তুনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাসকে আড়াল করে, ছদ্ম ইতিহাসবিদদের বিকৃত ইতিহাসকে মান্যতা দিয়ে ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের গরিমাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। দিল্লীর কুতুবমিনার তৈরিতে কুতুবউদ্দিন ও ইলতুতমিসের নামের বদলে সমুদ্রগুপ্তের নামকে যুক্ত করা হচ্ছে। এটি ঐতিহাসিক সত্যকে পাল্টে ঐতিহাসিক অসত্যকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

জাতীয় শিক্ষানীতি '২০ তৈরিতে রাজ্যগুলির মতামতকে উপেক্ষা করে শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ ও গৈরিকীকরণের ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়েছে। সংঘের মতাদর্শ অভিমুখী বিভিন্ন বোর্ডের পাঠক্রম চালু হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' পাঠ্যপুস্তক থেকে হারিয়ে গেছে। নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেন আজ ওদের কাছে 'ব্রাত্য'। সম্প্রতি শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণে ছাত্রদের বাধ্য করা হয়েছে। জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়ে নতুন পাঠক্রম চালু করা হয়েছে। বকলমে শিক্ষাকেও বাজারীকরণ করে কর্পোরেটদের ভেট দেওয়ার বন্দোবস্ত পাকা করা হচ্ছে।

সরকারী নীতির বিরুদ্ধাচারণ করলেই দেশদ্রোহী, খালিস্তানী, আন্দোলনজীবী, শহুরে নকশাল ইত্যাদি অপমানসূচক তকমা দিয়ে UAPA আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। লাভজিহাদ, ঘর ওয়াপসি, নীতি পুলিশের নামে ফতোয়া জারি করে সংখ্যালঘুদের চরম হয়রানি করা হচ্ছে। সংবিধান প্রদত্ত বাক্ স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে নরেন্দ্র দাভোলকার, অধ্যাপক কালবুর্গি, ডাঃ কাফিল খান, সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পান ও গৌরি লঙ্কেশ, মহম্মদ একলাখ সহ বহু নাগরিককে সংঘ পরিবারের রোষানলে পড়তে হয়েছে অথবা খুন হতে হয়েছে। অপমানে রোহিত ভেমুলাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে। এখনও দোষীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সম্প্রতি বড়দিনের উৎসবে দেশজুড়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের উপর আক্রমণ নামিয়েছে সংঘ পরিবার। ১৯৫০-এ মাদার টেরিজার তৈরি মিশনারীজ অব চ্যারিটির বিদেশী অনুদানের অনুমোদন বন্ধ করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ডিসেম্বরে হরিদ্বারের ধর্মসংসদে হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় নেতারা বক্তব্যে মুসলিমদের নিকেষ করতে অস্ত্র হাতে তুলে নেবার ডাক দেন।

স্বাভাবিক কারণেই এটা পরিষ্কার সাভারকারের 'হিন্দুত্ব' ও বিবেকানন্দের 'হিন্দু ধর্ম' এক নয়। 'হিন্দুত্ব' একটি মতবাদ—যেমন পুঁজিবাদ, সমাজবাদ ইত্যাদি। হিন্দুত্ব হল রাষ্ট্রের হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব। জাতীয় পরিস্থিতির এই আবহে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ' বিরোধী ঐক্য গড়ে তোলা আবশ্যক। লড়াইটা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, ধর্মের কারবারীদের বিরুদ্ধে। কার্ল মার্কস বলেছেন ধর্ম মানুষকে সৃষ্টি করেনি, মানুষই ধর্মকে সৃষ্টি করেছে'। আন্দোলন সংগ্রামের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে ভেদাভেদের বিরুদ্ধে চাই ঐক্যের লড়াই। কর্পোরেট হিন্দুত্ববাদীদের নয়া জোটের বিরুদ্ধে চাই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক মানুষের জোট। প্রতিদিনকার জীবন জীবিকার যন্ত্রণাকে আড়াল করতে শাসকের হাতিয়ার ৮০/২০ লড়াই। আমাদের দায়িত্ব তাকে শোষক-শোষিতের লড়াইয়ে পরিণত করা। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তিতে দেশ ও জনগণকে বাঁচাতে এবারের ২১তম ধর্মঘটে আওয়াজ উঠুক—ভারতের মাটিতে দেশ ও জনগণের প্রধান দুই বিপদ নয়া উদারবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিপাত যাক। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।